স্থধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

স্বপ্না প্রেস লিমিটেড

৮।১, লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা—১

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা

আধুনিক-বাংলার সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী

শ্রীমনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর (২য় সং)

এই মর্ত্যভূমি (২য় সং)

দূরের মিছিল (২য় সং)

ছায়া-মারীচ (২য় সং)

মনে মনে

* * * * * সূচীপত্র * *

✽ ✽ ✽ মধ্য দিনের গান ✽ ✽ ✽

কি কথা বলবে তুমি ?

প্রশ্ন করলেও মনে মনে মেয়েটি জানতো কি কথা জানাতে চায় তার প্রিয়তম। সেই পুরানো সমস্যা যা সে শুনেছে বার বার।

একই আপিসে ছেলেটি কেরানী আর মেয়েটি টাইপিস্ট। মন দেয়া-নেয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন ঘর বাঁধবার ক্ষণ। কিন্তু উপায় নেই। বসন্ত এসে গেলেও এখনও সাজি ভরে ফুল তুলে মালা গাঁথবার সময় আসে নি। আরও অর্থ চাই। সংসারে সুখ শান্তি আনন্দ বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্তমান উপার্জন যথেষ্ট নয়।

মুহূর্তের জন্যেও কঠিন বাস্তবের কথা ভোলে না ইংরেজ। প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে দেহ মন দুলে দুলে উঠলেও দিশা হারায় না। জীবনে উচ্ছ্বাস নেই। আছে নিস্তরঙ্গ গভীরতা। যখনই বোঝে ভালবাসায় খাদ আছে, মনের গভীরে ফাঁক আছে, কোথাও কোনো ফাঁকি আছে, তখনই সম্পর্ক শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

ছেলেটি মৃদুস্বরে বলে, আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে—যদিও মুখ ফুটে বলল, তবু ছেলেটি জানতো, একথা না বললেও ক্ষতি ছিল না। যাকে বলা হল সে তো সবই জানে। সে জানে, এবছর দুজনকেই হতাশ হতে হয়েছে। সদাগরী আপিস। লোকসানের তালিকা বেড়েছে বলে কারুরই মাইনে বাড়ে নি। কাজেই চোখ বুজে আরও এক বছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। স্বল্প আয়ে উচ্ছ্বাসের মোহে বিয়ে করে কিছুতেই দিনগুলি ম্লান করে তুলবে না ইংরেজ ছেলেমেয়ে। তাই কথা শুনে মেয়েটি দুঃখিত হবে না, অনুযোগ করবে না। উপায় যখন নেই তখন ধৈর্য ধরে হাসিমুখে অপেক্ষা করবে। আর ছেলেটিকে মেয়েটির মনে হবে নিশ্চিন্ত নির্ভর। যে সব সময়

বাস্তবের কথা ভাবে। যৌবনের উত্তাপে মন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলেও লঘু কথা বলে স্থূল বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলে না প্রিয়তমার কাছে।

দুপুর বারোটা বেজে গেছে। আপিসের ক্যানটিনে লাঞ্চ খেতে খেতে ওদের কথা হচ্ছিল। বারোটা থেকে দু'টো অবধি মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। এরই ফাঁকে ফাঁকে যে যার সুবিধা মতো সময় করে নেয়। বাড়ি গিয়ে খাবার সময় নেই। বাড়ি অনেক দূর। বাসে কিংবা টিউব ট্রেনে যাওয়া আসার যা খরচ লাগবে তা দিয়ে আপিসের ক্যানটিনে সুন্দর খাওয়া পাওয়া যায়। কাছাকাছি বাড়ি হলেও তারা এ সময় গৃহে ফিরে আহারের আয়োজন করে সময় নষ্ট করত না। যদি র‍্যাশনে কুলোতো তাহলে সঙ্গে নিয়ে আসতো মধ্য দিনের আহার। তারপর কাজ করতে করতে সুযোগ বুঝে এক সময় খাওয়া সেরে নিতো।

মেয়েটি বলল, চলো এবার ছুটিতে আমরা অনেক দূরে কোথাও ঘুরে আসি ?

কোথায় যাবে ? স্কটল্যাণ্ড ?

আমার তো খুব ইচ্ছে, তবে পয়সায় কুলোতে পারবো কিনা জানি না—

আমি বোধ হয় পারব কারণ নতুন বছর থেকে পোস্ট আপিসে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু করে জমিয়ে যাচ্ছি।

তুমি বুদ্ধিমান লোক, মেয়েটি হেসে বলল, আমার দ্বারা বোধ হয় কোনদিনও কিছু জমানো হবে না। যাক, তোমার জমাবার কথা জানা রইল, দরকার হলে ধার নেয়া যাবে।

কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হেসে বলল, আমার সব কিছুই তো তোমার।

কাস্টার্ডের বাটি সামনে নিয়ে খুব আস্তে মেয়েটি বলল, জানি। আর তাই তো মাঝে মাঝে লজ্জায় মরে যাই—

ছেলেটি অবাক হয়ে বাধা দিল, কেন ?

ভাবতে বড়ো ভালো লাগে যে, তোমার সব কিছু আমার, একটু থেমে মেয়েটি আবার বলল, আমারও সব কিছু যে তোমার। কিন্তু কি আছে আমার? তুমি তো রাজা। তাই মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজেকে বড় ছোটো মনে হয়। আমি তোমার সব নিলাম কিন্তু তোমাকে দিলাম কি? মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ছেলেটি হেসে বলল, আজ তোমাকে বেশ ভাবপ্রবণ মনে হচ্ছে। হঠাৎ কী হল তোমার?

এপ্রিলের প্রথম দিক। বসন্তের আরম্ভ। ন্যাড়া গাছগুলি পাতায় ফুলে ভরে উঠেছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক ভেসে আসে। হাওয়ায় ঠাণ্ডার স্পর্শ থাকলেও অনেকক্ষণ আলো থাকে। তবু এখনও মাঠে কিংবা পার্কে বসবার সময় হয় নি। ঘাস ভিজে থাকে আর থেকে থেকে হাওয়ার শাণিত তীর গোপন কথার খেই হারিয়ে দেয়।

ছেলেটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি ঠিক তেমনি স্বরে বলল, কতো কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু সময় কবে হবে! সময় কোথায়!

ওদিকের একটা টেবিল একেবারে খালি। সেখানে বসে আস্তে আস্তে খাচ্ছে শুধু এক বুড়ি। টেবিলটি ছোটো, সেখানে মাত্র আর একজনের জায়গা হয়। বুড়ি খাচ্ছে আর পায়ের শব্দ শুনে বার বার মাথা তুলে তাকাচ্ছে—যদি সে আসে। রোজ এমন সময় আর একজন তার সামনে বসে লাঞ্চ খায়। আজ সে বুড়ো আসে নি।

বুড়োর ঠাণ্ডা লাগল নাকি? যা অসাবধান লোক। বুড়ির চোখে মুখে কেমন হতাশা ফুটে উঠলো। হয়তো আর কতোদিন তারা এক সঙ্গে বসে খেতে পারবে না ঠিক নেই। খেতে আর ইচ্ছে করে না বুড়ির। ছলো ছলো চোখে শুধু এপাশে ওপাশে তাকিয়ে যেন কার পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুড়ো আর আসে না সেদিন। আবার কবে আসবে? আবার কবে সময় হবে? সময়! বুড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সেই আপিসের একজন বুড়ো গোছের কর্মচারী এক ভারতীয় বন্ধু নিয়ে খেতে বসেছে। খাওয়া বড়ো নয় ইংরেজের কাছে। খেতে খেতে কথা বলা বেশি আনন্দের। ইংরেজ কর্মচারী অনেক কষ্টে আজ লাঞ্চের সময় ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করতে পেরেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে তাদের আলাপ হয়েছে। তাই আজ অনেক পুরোনো কথা হচ্ছে দুজনের—যেন ফুরোবে না। আবার কবে দেখা করবার দিন স্থির করতে পারবে তারা জানে না। শিগ্‌গির আর সময় হবে না।

সত্যি সময় নেই। শুধু যাদের কথা বলা হল তাদের নয়, ইংল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণের আলাপে প্রলাপে কূজনে বিজনে বেশীক্ষণ কাটাবার সময় নেই। এর জন্যে তারা দুঃখিত নয়, এর জন্যে তারা অনুযোগ করে না। দূর থেকে ইংরেজকে দেখলে তাই অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, তারা যেন প্রাণহীন পুতুলের দল। তাদের উচ্ছ্বাস নেই, সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এদের দিকে তাকিয়ে অনেকবার ভেবেছি কেমন করে এদেশ অসংখ্য দরদী কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি করল। নীরস কঠিন শুষ্ক ইংরেজ শুধু বুঝি নিজের স্বার্থ বোঝে। তাই সর্বপ্রথম এরা ভালো ভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে।

অনেকদিন আগে ইংরেজের চালচলন কেমন ছিল সেকথা বর্তমানে বলবার প্রয়োজন নেই। তবে আজকের ইংরেজ অতিমাত্রায় হিসেবী, অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। যৌবনের যে দুরন্ত আবেগ মানুষকে বেহিসেবী করে তোলে, সে-আবেগের অর্থ ইংরেজের পক্ষে বোঝা কঠিন। আর যদি কেউ বোঝে তাহলেও তা প্রকাশ করবে না কোনোদিন। কেননা, তার মতে তাতে শুধু তার নিজেরই ক্ষতি হবে।

ফ্রান্সে দেখেছি, দুরন্ত যৌবনের প্রাণময় প্রকাশ। "তোহারি কারণ সব সুখ ছাড়িনু"—একথা একজন ফরাসীর মুখে খুব সহজেই উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু যদি কোন ইংরেজের মুখে একথা শোনা যায় তাহলে তাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। কেননা, যার যতটুকু পাওনা তার বেশি সে

দেবে না, নিজের যা প্রাপ্য তার বেশি চেয়ে কাঙালপনার পরিচয় কিছুতেই দেবে না। তাই "কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো আর কি তোমার চাই—" এমন ভাবনা ইংরেজ কবির মাথায় কখনও আসবে না।

বস্তুত সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ইংরেজের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই ব্রেকফাস্টের ভাবনা ভাবতে হবে। স্ত্রী মুখের সামনে চা এনে ধরবে না, তাকে সমানে সাহায্য করতে হবে প্রাতরাশ রান্না করবার সময়। শীতের দেশ। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে সাড়ে সাতটা—আটটা বেজে যায়। সাড়ে নটা থেকে আপিস। কাজেই ঘুম থেকে উঠে কোনদিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় নেই। কোনোরকমে অতি দ্রুত শুধু প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। যার সুবিধা হল লাঞ্চের জন্যে সঙ্গে করে গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ নিয়ে গেল। যার ওই সামান্য আহারে হবে না, সে শূন্য হাতে বেরুল। যথাসময়ে বাইরে খাওয়া সেরে নেবে।

আপিস ভাঙতে ভাঙতে সাধারণত সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটা। শীতকাল হলে বিকেল আর নেই তখন। ঘন অন্ধকার নেমে গেছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উজ্জ্বল আলোর সামারোহ। তবু আলোর দিকে তাকিয়ে যারা সংসারী তাদের কবিত্ব করবার সময় নেই। শুধু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে যন্ত্রচালিতের মত বলে, কী সুন্দর দিন! তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বাড়ি তাকে ফিরে যেতেই হবে। আপিসের কাজ শেষ হলো, এখন বাড়ির কাজ শুরু হবে। স্ত্রীকে রান্নায় সাহায্য করতে হবে, থালাবাসন ধুতে হবে। তারপর হয়তো কোনো ক্লাশ করতে ইস্কুলে যেতে হবে।

কথাটি শুনতে অবাক লাগে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত লোক সান্ধ্য ক্লাশ করে থাকে। অল্প আয় বলে তারা অনুযোগ অভিযোগ করে না কিংবা চুপচাপ বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে হা হুতাশ করে না। সেই স্বল্প আয়ে সুন্দর করে সংসার সাজিয়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সন্ধ্যেবেলা ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র প্রায় সব রকম সান্ধ্য ক্লাশ বসে। ফরাসী জার্মান—নানা ভাষা শেখানো থেকে আরম্ভ করে ছুতোরের কাজ, খেলনা

তৈরি করা, সেলাই, রান্না, বাগান করা সমস্ত কিছুই শেখানো হয়। এইসব ক্লাশে ভিড় হয় প্রচুর।

ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী রাত্তিরে খাওয়ার পালা শেষ করে এইরকম একটা ক্লাশে গিয়ে পাঠ নেয়। যার ছেলেমেয়ের খেলনার দরকার অথচ কেনবার সামর্থ্য নেই, সে খেলনা তৈরি করা শেখে। যে মেয়ে রেস্তোরাঁয় চাকরি করতে চায় সে রান্না শেখানোর ক্লাশে ভর্তি হয়। যাঁরা কবি প্রকৃতির অথচ নানা সরঞ্জাম কিনে ঘর সাজাতে পারে না তারা বাগান করা শিখে বাড়ির ছোট উঠোন ফলে ফুলে ভরে তোলে।

এইরকম অনেক কাজে ইংরেজ সব সময় ব্যস্ত। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য আর নিজের সংসারের সকলের সুখ-সুবিধার ভাবনা ছাড়া তার যেন আর কোনো ভাবনা নেই। আতিথেয়তার বালাই ইংল্যাণ্ডে একরকম নেই বললেই চলে।

একথা উঠলেই আমাদের দেশের সঙ্গে সে-দেশের তুলনা করতে ইচ্ছে করে। আমাদের আতিথেয়তার কথা পৃথিবী-বিখ্যাত। গত যুদ্ধের সময় যখন বহু বিদেশী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করতো তখন আমরা তাদের বাড়িতে ডেকে যোড়শোপচারে যে আদর আপ্যায়ন করতাম সেকথা তারা জীবনে ভুলবে না। শুধু বিদেশীদের কথা কেন, কাউকে নেমন্তন্ন করলে আমরা একদিনে যে পরিমাণ খরচ করি সে-পরিমাণ খরচ করে অতিথি সৎকারের কথা একজন ইংরেজের পক্ষে কল্পনা করাও অসাধ্য।

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসাহী যে ইংরেজদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং যারা আমার বাড়িতে দিনের পর দিন প্রচুর চা মিষ্টি আর মাছের অজস্র রকম তরকারী খেয়ে গেছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বিলেতে আমার আবার দেখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে আশা করা স্বাভাবিক যে, তারাও আমাকে ঠিক তেমনি করে অন্ততঃ একদিনের জন্যে তাদের বিশেষ বিশেষ রান্না খাওয়াবে।

স্বীকার করে নেয়া দরকার যে, আমাকে এবং আমার মত আরও অনেককে একেবারে হতাশ হতে হয়েছিল। কিন্তু সেকথা সবিস্তারে বলা বর্তমান

আলোচনার সঙ্কীর্ণ পরিসরে অবান্তর। শুধু এইটুকু বলি যে, ইংরেজ সাধ্যের বাইরে কিছু করে না এবং তাদের ধর্ম হল আগে নিজে আর পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে তুলে রেখে তারপর লৌকিকতা করা।

আমাকে সেইসব বিদেশী বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই নেমন্তন্ন করেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তারা প্রত্যেকে যা খায় তাই থেকে শুধু সামান্য ভাগ দিয়েছিল মাত্র। মাসের শেষে আমার মত টাকা ধার করে সারাদিন বাড়ির লোকদের বিব্রত করে রান্নার আয়োজন করে নি। কিংবা একজন বিদেশী পাছে আতিথেয়তার কোনো ত্রুটির কথা স্মরণে রাখে এই মনে করে নিজের সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে অথিতিকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থেকে নিজেকে অকারণে ক্লান্ত করে তোলে নি। আমি যা মনে করি না কেন, আমার কোনো ইংরেজ বন্ধু বাড়ির কাউকে আমার জন্যে বঞ্চিত করে নি। সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশী বন্ধু এসেছে বলে আমার দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যে পরিবারের কারুর বিশ্রামের সামান্য ব্যাঘাত করে নি।

কিন্তু এ নিয়ে কোন কথা বলে লাভ নেই আর এর জন্যে শুধু শুধু অভিমান করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেও ফল নেই। আমাদের আতিথেয়তার কথা তারা চিরদিন মনে রাখবে আর তাদের কার্পণ্য ও শুষ্ক লৌকিকতার কথা আমরাও ভুলবো না। তারা আমাদের মত অতিথি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে প্রচুর ব্যয় করবে না, আমরা তাদের মত শুকনো লৌকিকতা করে কোনোদিনও অতিথিকে বিদায় করতে পারব না। বিলেত থেকে তাদের ঘরের খবর জেনে এলেও আবার যদি আমার বাড়িতে কোনো ইংরেজ অতিথি আসে আমি ঠিক আগের মতই তাদের যত্ন করবো, তাদের জন্যে ব্যয় করে আবার হয়তো ঠিক তেমনি আনন্দ পাবো। আর মনে মনে বলবো, 'যস্মিন দেশে যদাচার'।

শুধু এই কারণে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আমাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়! যা আশা করি, তা কিছুতেই পাই না। কর্তব্য-কঠোর জাতের মধ্যে এসে আমাদের কোমল প্রাণে বার বার রূঢ় আঘাত লাগে।

সকাল থেকে রাত্তির অবধি একজন মানুষ শুধু কাজের কথা ভাবে, শুধু

কাজের কথা বলে, আর কোনদিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে আপন মনে শুধু কাজ করে যায়। এরা কখন প্রেমে পড়ে, এরা কেমন করে ভালবাসে, এরা কখন মুহূর্তের জন্যে কাজের কথা ভুলে আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সেকথা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

অথচ গ্রীষ্মের হাল্কা রোদ্দুরে পার্কে পার্কে হাজার ছেলেমেয়েকে শুয়ে বসে আধশোয়া অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে দেখেছি। তখন তাদের দেখে ভাবতাম, এদের কখন আলাপ হল, এরা কেমন করে ঘনিষ্ঠ হল, এরা কি এখন আবোলতাবোল বকে এ ওর কাছে হৃদয় মেলে ধরছে। কিন্তু এই পার্কে শুয়ে থাকা কতক্ষণেরই বা ব্যাপার। কয়েক ঘণ্টা মাত্র। হয়তো আবার দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারবে কি না, সেকথাও জানা নেই। আর এমনি আলাপ যে তারা প্রাণ থেকে করে, তা-ও মনে হতো না। প্রিয়জনের জন্যে কালেভদ্রে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করা যেন তাদের কর্তব্য। প্রাণের তাগিদে নয়, কর্তব্যের তাগিদে ইংরেজের প্রতি পদক্ষেপ।

কর্তব্য-কঠোর ইংরেজের অধীনে কোথায় প্রাণের উৎস, কোথায় রসের ফোয়ারা, মনের কোন নিভৃত গহনে ফুটে আছে ফুল—তার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই আমাদের বারে বারে তাদের বুঝতে ভুল হয়। মনে হয় এদের শুষ্ক কঠিন জীবনে কোন কোমলতা নেই, নিজেকে বিলিয়ে দেবার উন্মাদনায় এরা কখনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা যেমন বুঝিয়েছিল তেমন বুঝেছিলাম, প্রথম ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চারপাশে তাকিয়ে মেনে নিতে দ্বিধা করি নি যে, এ জাত ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না, এরা কোনদিন যৌবনের উন্মাদনায় দিশা হারায় না।

একথা মেনে নিতে বাধ্য হলেও মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধেছিল, আর এদের যান্ত্রিক জীবনযাত্রার কথা ভাবলেই অনন্তর সেটা খচ খচ করে উঠতো। ভাবতাম, এ হতেই পারে না। যে দেশের কাব্যে গল্পে এত প্রেম, যে দেশের গানে ছবিতে এত বিরহ, যে দেশের জলে স্থলে প্রেমালাপের এত জীবন্ত প্রকাশ—সে কি সত্যি শুধু অভিনয়? সে সব কি শুধুই কঠিন কর্তব্যের

তাগিদে ? চেহারা দেখে তেমন মনে হত না, কথা শুনে সে কথা ভাবতে পারতুম না। অথচ দুর্ভাগ্য আমার, বহুদিন কিছুতেই তাদের লৌকিকতা আর কর্তব্যের অন্তরালে রসের বেদনার সহানুভূতির যে নিঃশব্দ প্রবাহ চলেছে, তার সন্ধান পেলাম না। তারপর অনেকদিন ইংরেজের দেশে ইংরেজের ঘরে বাস করবার পর যখন তাদের অন্তরের আসল পরিচয় পেতে শুরু করলাম, তখন নিজের এতদিনের এই ধারণার জন্যে মনে মনে লজ্জা পেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, শুধু প্রকাশ করবার ভঙ্গী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন জাতের সঙ্গে ইংরেজের মূলত আর কোন প্রভেদ নেই।

আমরা প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিই। আমাদের কল্পনা-বিলাস বহুবার আমাদের আসল অবস্থা ভুলিয়ে অকারণ অলীক স্বপ্ন দেখায়। কথা বলি বেশি, কাজ করি কম। যৌবনের আশ্চর্য আলোড়নে সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে প্রিয়জনকে যতটুকু বলবার, তার চেয়ে অনেক বেশি বলি, সামর্থ্য যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশী কাজের ভার নিয়ে নিজেকে বিব্রত করে তুলে বার বার দিশা হারাই। তাই দিনে দিনে একদিন উচ্ছ্বাসের ঝড় থেমে যায়, কল্পনা শূন্যে মিলায়, কথা জুড়িয়ে যায়, কথা ফুরিয়ে যায়। শুষ্ক সংসারে বাস্তবের নির্মম আক্রমণে তখন শুধু যন্ত্রের মত ঘুরে ফিরি। সব কিছুর উপর যেন যবনিকা নেমে এসেছে, ফুরিয়ে গেছে অনর্গল অবান্তর কথা বলার দিন। কোথাও রঙ নেই, রস নেই, রূপ নেই, যে প্রিয়তমার জন্যে একদিন সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম, তাকে যেন বোঝা বলে মনে হয়। বার বার সময়ে অসময়ে নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করি। কোথায় গেল সেই আমি—যার কাছে একদিন এই বসুন্ধরা অতি ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল ?

নিজেকে খুঁজে পাই না। নিজেকে যেন চিনি না। তাই শুধু ঝরে অনেক দীর্ঘশ্বাস। কল্পনায় পাই, বাস্তবে হারাই—যা পেলাম তার চেয়ে অনেক বেশি হারালাম। আমি তো ভাবিনি আগে কতোখানি পাবো ? কতোটুকু আমার পাওনা ? কল্পনায় পেয়েছিলাম অনেক বড় অংশ, কিন্তু বাস্তবে যে ঠকে গেলাম। তার জন্যে কার কাছে অনুযোগ করবো ? কেউ তো

পরিমাণের কোন শপথ করে নি। সে যে আমারই বিলাসী মনের অলসমন্থর মুহূর্তের ব্যাপক কল্পনা। তাই ঠকে যাই, তাই অকারণে কেঁদে মরি। যা নেই, নির্বোধের মতো পলে পলে তাই খুঁজে খুঁজে অবশেষে ক্লান্তি আর হতাশা সম্বল করে আত্মার আত্মীয়কে আঘাতের পর আঘাত করি।

ইংরেজের সঙ্গে শুধু সেইখানে আমার প্রভেদ। ইংরেজ আশা করে কম। যেটুকু পায় সেটুকু অতিরিক্ত পাওয়া বলে সযত্নে তুলে রাখে। জীবনকে নেয় সহজভাবে। মনগড়া কল্পনায় প্রাসাদ রচনা করে চোখের সামনে বাস্তবে পর্ণকুটির দেখে হতাশায় ভেঙে পড়ে না। যা স্বাভাবিক তাই তাদের প্রিয়। উচ্ছ্বাসের উত্তাল ছন্দে অস্বাভাবিক মুহূর্ত দিনের পর দিন তাদের মাতাল করে তোলে না।

ইংরেজের নিজের মনে যদি ঝড় বয়ে যায় তাহলে বাইরে হবে তার সংযত প্রকাশ। যৌবনের আলোড়নে কথা বলবার মাত্রা হারিয়ে যাবে না কিংবা কাজে ভাঁটা পড়বে না। নিজেকে কোনো কারণে সহজে বিস্মৃত হয় না ইংরেজ। আগে তার কাজ, পরে তার ব্যক্তিগত জীবন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে আনন্দ খোঁজে, অকরুণ ব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ বুঝে হঠাৎ কখন ধরে রাখবার চেষ্টা করে অনেক রঙীন মুহূর্ত, বলে যায় দরদী মনের অনেক ব্যথা-ভরা কথা, কখনও চোখে মুখে ফুটে ওঠে প্রাণের অন্ধ আবেগ।

সময় নেই। নিজেকে বেঁচে থাকতে হবে। যত ভালোভাবে মানুষ এই দুঃসময়ে বেঁচে থাকতে পারে তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সংসারের সুখ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আছে বা আর কতোটুকু? কিন্তু যা আছে তাকে সুদে আসলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে। অনুযোগ নয়, অভিনয় নয়, কঠিন কাজ আর কর্তব্যের মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করে অভাব এড়াতে হবে—যেন কোনোদিন পরের কাছে হাত পাততে না হয়।

প্রেমের ব্যাপারে তাই। বন্ধুত্বের বেলাও তাই। চেয়ে পায় ভিখিরী, কেড়ে পায় নিষ্ঠুর, ছেড়ে পায় অতি-মানুষ। ইংরেজ চায় না, কাড়ে না, ছাড়ে না, যা আপনি আসে তা ভক্তি দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, যা স্বতঃস্ফূর্ত

তা অবশ্যম্ভাবী বলে গ্রহণ করে। যা থাকবে না তা ধরে রাখবার চেষ্টা করে নিজেকে ছোট করে না। যা রইল না তার শোকে বিহ্বল হয়ে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে না। শোকে দুঃখে ঝড়ে অন্ধকারে ইংরেজ ধীর স্থির নম্র বিনয়ী। তারা এত সাধারণ যে যন্ত্র বলে মনে হয়। প্রতি মুহূর্তে এক রকম। জোরে হাসে না, চেঁচিয়ে কথা বলে না, বুক চাপড়ে কাঁদে না। সহজভাবে যে জীবনকে গ্রহণ করতে পারে নিঃসন্দেহে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। ইংরেজকে যতোই গালমন্দ করি না কেন, একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজ বুদ্ধিমান।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার ঘটনাচক্রে একটি সুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সেইদিন বিদায় নেবার আগে সে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

গভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিলাম, যেদিন তুমি দেখা পেতে চাইবে।

চোখ বড়ো করে নিঃশব্দে মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর করুণ স্বরে বলেছিল, সে কি, তোমার কাজকর্ম কিছু নেই?

আমি বলেছিলাম, আছে। কিন্তু তোমার আহ্বানে আমি সব কিছু তুচ্ছ করে সাড়া দেব।

বুঝেছিলাম মেয়েটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিল এবং আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর উৎসাহ প্রকাশ করে নি। তখন অবশ্য কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছিলাম। যথাসময়ে বুঝেছিলাম কেন মেয়েটি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে নি। আমি সব কিছু তুচ্ছ করে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি—একথা শুনে সে হতাশ হয়েছিল। ভেবেছিল আমার বুদ্ধি অপরিণত। কারণ ইংল্যাণ্ডের কোনো মানুষ এমন অসংযত কথা বলে না। তারা ডাইরি খুলে ভাবে। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে একটা দিন ঠিক করবার চেষ্টা করে।

সময় কম। সময় নেই। সময় চলে যায়। তবু হাজার কাজের মাঝে থাকলেও মানুষের মন ক্ষণকালের জন্যেও বিশ্রাম খোঁজে! কি যেন চায়!

মুক্তির মন্ত্র শোনে। কাজ করতে করতে ক্ষণকালের জন্য হিসেবী মন পাখা মেলে, কাজের মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, ক্লান্তির বদলে ইংরেজের মনে বেজে ওঠে গান—মধ্য দিনের গান।

দুপুর বারোটা থেকে দুটো। ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ যেন ভাঁটা পড়ে। পদক্ষেপের গতি হ্রাস পায়। আপিসগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন ছুটি হয়ে গেল। এর মধ্যেই মধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁর সামনে লম্বা 'কিউ' হয়ে গেছে, আপিসের ক্যান্টিনে আর জায়গা নেই, কাফেগুলিতে কোলাহল জেগেছে আর বড় বড় হোটেলের সামনে একটির পর একটি গাড়ি দাঁড়াচ্ছে—কেউ এনেছে প্রিয়জনকে, কেউ এনেছে বন্ধুকে, আর কেউ বা হয়তো এনেছে আর এক ব্যবসায়ীকে—খেতে খেতে তার কাছ থেকে সৎপরামর্শ নিয়ে নেবে।

'কিউ'-এ কেউই একা দাঁড়িয়ে নেই। সঙ্গে রয়েছে বান্ধবী কিংবা দূর থেকে এসে পড়া কোনো আত্মীয় আর নয়তো আপিসের যে কোনো কেউ। দিনের মধ্যে হাজার কাজের মাঝে হয় বারোটা থেকে একটা নয় একটা থেকে দুটো—এই এক ঘণ্টার জন্যে ইংরেজ যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। বেশী কথা বলে, খাওয়া যেন আর ফুরোয় না। শুধু তো এক ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু ইংরেজের তখনকার চেহারা দেখলে মনে হয় তার যেন সারা জীবন অবসর। খুব আস্তে সুপে চুমুক দেয়, আরও আস্তে কাঁটা চামচ মুখের সামনে তোলে। ধীরে সুস্থে এড়িয়ে গড়িয়ে খাওয়া শেষ করে। কোনো তাড়া নেই, কোনো কাজ নেই, শরীরে কোথাও ব্যস্ততার ইঙ্গিত নেই। কে বলবে মাত্র এক ঘণ্টার ছুটি—কে বলবে আর একটু পরেই ফুরিয়ে যাবে এই অবসর ক্ষণ! কাজের চাপে আবার দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে।

অবসরের হাল্কা রোদ্দুর লেগেছে, হোক ক্ষণিকের আলো—তারই টুকরো ঝড়ে পড়ুক ব্যস্ত মনের আনাচে কানাচে, নিয়ে যাক অন্য জগতে, জ্বালিয়ে তুলুক প্রাণের প্রদীপ আর মধ্য দিনে চারপাশে বেজে উঠুক ঘর বাঁধবার অনেক নতুন গান।

* * * লণ্ডনে ভারতীয় লেখক *

আপনি যদি ভারতীয় হন আর সামান্য একটু ভালো ইংরেজী লেখেন তাহলে আপনি যেই হন না কেন, কোনো রকমে একবার লণ্ডনে গিয়ে পড়তে পারলে অনায়াসে রাতারাতি ইংরেজ পাঠক-সাধারণের কাছে 'Famous Indian Writer' বলে পরিচিত হতে পারেন। প্রকাশকের অভাব আপনার হবে না, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন ইংরেজের কৌতূহল বেড়েছে, নিজের দেশ নিয়ে আপনি যা লিখবেন সেখানে তাই 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' হয়ে উঠবে।

আমার অনেক বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত এই খ্যাতি লাভ করে লণ্ডনে আসর জাকিয়ে বসেছেন। তিনশো-চারশো পাউণ্ড করে একটি মাত্র বই-এর জন্যে বিদেশী প্রকাশকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়ে দিব্যি আরামে আছেন—সভা-সমিতিতে নিয়মিত নেমন্তন্ন পেয়ে দেশের কথা যা খুশি তাই বলছেন। দুঃখের বিষয়, বৃটিশ পাঠক-সাধারণের কাছে এঁদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের চরম নিদর্শন। এঁরা বহুদিন বিলাত বাস করেছেন, ইংরেজী শিখেছেন, ঝালিয়েছেন। কেউ কেউ ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারী করছেন, আর কেউ কেউ কেরাণী কিংবা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের স্কুলের সাধারণ মাস্টার।

ফএল্‌স থেকে আরম্ভ করে ওয়েস্টএণ্ডের অলিতে-গলিতে যে কোনো ছোটো-খাটো বই-এর দোকানে নানা দেশের সাজানো অসংখ্য বই দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি বিশেষ বই-এর ওপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে। লেখকের নাম ধরুন—অমর ঘোষ, কিংবা এস. এম. মারাথ, অথবা নোয়েল সরকার। এঁরা আমাদের দেশের লোক। অনেক নোবেল প্রাইজ পাওয়া দেশ-বিদেশের

প্রসিদ্ধ লেখকদের নানা বই-এর পাশে হঠাৎ এঁদের বই দেখে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। মনের ভাব বুঝে দোকানদার তখুনি কাছে এগিয়ে আসে—

'অদ্ভুত বই হয়েছে স্যার, দেবো নাকি ?'

'তুমি পড়েছো বুঝি ?'

'হ্যাঁ স্যার, এই লেখকের আরও একটা বই বেরুবে শিগ্‌গির—ভারতবর্ষের এতো রকম সুন্দর কথা বলেছেন তিনি—যা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতাম না।'

'তাই নাকি ?' নেড়ে চেড়ে বারো কি পনেরো শিলিং খরচ করে শেষ অবধি বইখানা কিনেই ফেলি।

একটি নয়, দুটি নয়, এমন অনেক বই আমি কিনেছি, ধৈর্য ধরে পড়েছি আর দিনের পর দিন অসহ্য জ্বালায় জ্বলেছি। দু-একপাতা পড়লেই বোঝা যায় এঁরা কেউই লেখক নন—দেশের কোনো ভদ্র কাগজে এদের লেখা কোনোদিনও প্রকাশিত হতো না, একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। দুর্বল কষ্টকল্পিত অত্যন্ত কাঁচা লেখা। ভারতীয় সাহিত্যিকদের অগ্রণী সেজে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা একান্ত হাস্যকর—বন্দেমাতরম্—গান্ধীজী কি জয় বলে কেউ কেউ অক্ষম কলমে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছেন—গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কেউ কেউ কিছুই বলতে পারেন নি কিংবা বাংলাদেশ অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত করতে গিয়ে পাতার পর পাতা সরস সাবলীল ইংরেজীতে প্রলাপ বকেছেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অজ্ঞ বিদেশী পাঠকের কাছে প্রচুর বাহবা পেয়েছেন। আর আপনি যদি সত্যি ক্ষমতাশালী লেখক হন এবং দেশে আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বলে খ্যাতি থাকে, তা হলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে কেউ শুনবে না, কারণ, আপনি ইংল্যাণ্ডের হাল-চাল তেমন জানেন না, আর সেই লেখকদের চোদ্দ-পনেরো কি তার চেয়েও বেশি বছরের ঝালানো ভাষার মতো ইংরেজীও লিখতে পারেন না। তাই মুখ বুজে

ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ইংরেজ পাঠক কি ধারণা পোষণ করছে—এই ভেবে দারুণ অস্বস্তিতে আপনার দিন কাটবে।

ভাবলাম, আর ক বছরই বা এদেশে আছি। সেই অল্পসময়ের মধ্যে যদি এদেশের লোককে আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্য কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে সে বিষয়ে সামান্য সচেতন করে দিতে পারি, তাহলে আর কিছু না পাই, আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকবৃন্দের আশীর্বাদ তো পাবোই। আর তাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো সম্বল। আমি ক্লাবে ক্লাবে ঘুরতে লাগলাম। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্যে উৎসাহী বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললাম। এমনকি, একদিন বিনা দ্বিধায় লণ্ডনের অধুনালুপ্ত উন্নতনাসা মাসিক-পত্র "Horizon"-এর সম্পাদক সিরিল কনোলীর সঙ্গে আলাপ অবধি করে এলাম।

সুখের বিষয়, সেই সব তথাকথিত লেখকদের লেখা কাগজ পত্রের সম্পাদকরা পছন্দ করেন না—তাই তাঁদের রচনা একেবারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এই সব কাগজপত্রের অনুকূল সমালোচনা তাঁরা পেয়ে থাকেন। এঁরা ভারতীয় লেখক বলে নাকি সম্পাদকদের এই পক্ষপাত, আর দুই দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের কথাও সমালোচনা প্রকাশ করবার আগে তাঁরা একবার ভেবে দেখেন।

যা-হোক, অনেক ঘোরাঘুরি করে সন্ধান নিয়ে জানলাম, নিজের প্রদেশে মাতৃভাষায় লিখে প্রসিদ্ধ এমন কোনো আধুনিক ভারতীয় লেখকের নাম লণ্ডনের পাঠক-সমাজ জানে না—খবরও রাখে না। বৃটিশ পাঠকের মতে—রবীন্দ্রনাথের পরই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় লেখক হলেন ডাঃ মুলুকরাজ আনন্দ, আর তার পর সেই সব অখ্যাত, অজ্ঞাত তথাকথিত লেখকের দল।

বলা বাহুল্য, ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় গেল সেই সব ইংরেজ-নন্দনরা—যুদ্ধের সময়ে যারা অনেক প্রগতিশীল বাঙালা কবি-সাহিত্যিকদের অঙ্গনে আনা-গোনা করে প্রচুর চা আর ইণ্ডিয়ান্ সুইটের সদ্ব্যবহার করতো? তারা কি প্রাণ দিলো যুদ্ধে? কেন তারা তাদের দেশবাসীর চোখ খুলে ভারত-সাহিত্যের ছবি দেখাবার সামান্য চেষ্টাও করলো না? কে

জানে, হয়তো করেছে! কিংবা কে তারা? হয়তো গ্রামে মাস্টারী করছে কিংবা দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসারের চরকি-কলে ঘুরছে। বাংলার সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে অসাহিত্যিক বিদেশী যোদ্ধাও সাহিত্যে রস পেয়েছিলো—কেউ কেউ কলমও ধরেছিলো কিন্তু নিজের দেশে সুবিধা পায় নি—পেতে পারে নি। তাই সাত-সমুদ্র তেরো নদী পারের কথা নিঃশেষে মন থেকে মুছে গেছে।

তবু "Horizon"-সম্পাদক সিরিলি কনোলীর কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম।

তিনি নিজেই সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, মাঝে মাঝে তোমাদের দেশ থেকে আমার কাছে রচনা আসে—বিশেষ করে তোমার দেশ থেকে, I mean **Bengal.** আমি প্রায়ই অনেক গল্প কবিতা পাই—

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না, প্রশ্ন করলাম, বাংলা দেশের যে সব লেখকদের কাছ থেকে আপনি লেখা পেয়েছেন তাঁদের কারুর নাম আপনার মনে আছে কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সিগারেটে টান মেরে মিঃ কনোলী বাংলার কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ আধুনিক কবি ও লেখকের নাম করলেন।

আমি প্রচুর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের লেখা আপনার কেমন লেগেছে?

খুব ভালো। মিঃ অমুকের কবিতায় আমি গভীর জিনিস পেয়েছি আর মিঃ তমুকের গল্পে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছে—এঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষমতাশালী লেখক।

এঁদের লেখা 'Horizon'-এ প্রকাশিত হয়েছে?

না, একটু থেমে মিঃ কনোলী বললেন, আমি খুব দুঃখের সংগে বলছি এঁদের ইংরেজী আমার ভাল লাগে নি—এই রকম অনুবাদ প্রকাশ করলে আমাদের পাঠক লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাবে না আর তাঁদের ইংরেজী ভাষাও একেবারে অন্য রকম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এই লেখকরা যদি

কিছুদিন এখানে ঘুরে যান তাহলে তাঁদের পক্ষে এদেশে খ্যাতিলাভ করা একেবারেই কঠিন হবে না—আমাদের দেশের পাঠক তাঁদের লেখা আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, মিঃ জওহরলাল নেহরুর ইংরেজী পড়তে পড়তে আমরা অবাক হয়ে যাই!

আমি আস্তে আস্তে তাঁকে বোঝালাম, অনেক সমুদ্রের ব্যবধান মিঃ কনোলী—এই সব শক্তিশালী লেখকদের পক্ষে দুম করে এদেশে আশা তো সম্ভব নয়, আর অন্য ভাষায় একজন লেখক সমান দক্ষতার পরিচয় না দিতেও পারেন—

খুব ঠিক কথা, মিঃ কনোলী হেসে কড়া সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কিন্তু সে ভাবনা আমার নয়, তোমার।

সিরিল কনোলীর সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনা হবার কয়েকদিন পর Victor Gollanez থেকে প্রকাশিত হলো শ্রীভবানী ভট্টাচার্যের "So many Hungers"। বাংলার দুর্ভিক্ষ-বৎসরের পটভূমিকায় লেখা ছোট উপন্যাস। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখক শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে-সময় শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু অনুবাদও নাকি প্রকাশিত করেছিলেন সেখানকার সাময়িক পত্রিকায়। মোটকথা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলে বাংলা দেশে ভবানীবাবুর খ্যাতি না থাকলেও নানা ইংরেজী রচনায় তাঁর সাহিত্যিক ও মার্জিত মনের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছিলাম। তাঁর ভাষার গাঁথুনি ও প্রকাশভঙ্গি বিদেশী পাঠককে মুগ্ধ করলো। এ বইটি সেখানকার অন্যান্য বই-এর তুলনায় একেবারে অন্য রকম। ভবানীবাবুর নাম প্রশংসিত হলো, ভালো বিক্রি হলো বই, বাসে-টিউবে-ক্লাবে অনেকের হাতে দেখতাম, "So many Hungers"। এ বইখানির নাম উল্লেখ করে এতো কথা বললাম এই জন্যে, কারণ এই "So many Hungers"-এর উপর ভর করে আমি অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। এর মধ্যে আমার পরিচিতের সংখ্যা আরও বেড়েছে। তারা এ বই পড়ে নানারকম কৌতূহল প্রকাশ করলো—বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক লেখকের কথা জানতে চাইলো। আর জিজ্ঞেস করলো, ভবানী ভট্টাচার্যের আর কোনো বই আছে কি-না?

আমি বললাম, আমার জানা নেই, তবে আমাদের দেশে আরও অনেক ব্যানার্জী, মিত্র, ঘোষ, বোস আছেন আর তাঁদের অনেক বইও আছে। "So many Hungers" তোমাদের ভালো লেগে থাকলে তাঁদের লেখাও খারাপ লাগবে না, বরং আরো বেশী ভালো লাগবে—

আমাকে বাধা দিয়ে ওরা বললো, পড়াও তাঁদের বই। আমি বললাম, দুঃখের বিষয় তাঁদের লেখা আজও ইংরেজীতে অনূদিত হয় নি—যে দুএকটি ছোটো গল্পের অনুবাদ হয়েছে সেগুলিও ঠিক তোমাদের ইংরেজী হয় নি—

তবু তাই পড়াও।

না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্, আমার কাছে যে বাংলা বইগুলি আছে আমি একে একে তাই তোমাদের ইংরেজী করে শোনাবো—আমার ইংরেজী খারাপ হলেও লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয় তোমরা পাবে—

প্রত্যেক রবিবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্তির নটা অবধি আমি নিয়ম করে তাদের পড়ে শোনাতাম। ফরাসী সাংবাদিক, জার্মান ও ইংরেজ লেখক-লেখিকা, লণ্ডন-অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও দুজন শিল্পী ছিলো আমার নিয়মিত শ্রোতা।

আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' ও 'মতিলাল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা'র সব কটি গল্প, মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। আরও অনেক পড়বার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু বই ছিলো না। দেশে বার বার চিঠি লিখেও পাইনি।

তারপর এই বইগুলি পড়বার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে আজও শিহরণ জাগে।

আশ্চর্য—অদ্ভুত! এইসব লেখক তোমাদের বাংলা দেশে? এঁরা সকলেই জীবিত? কেন এঁরা এখানে আসেন না? কেন এতোদিন এঁদের লেখা অনুবাদ করা হয়নি? আমাদের বাংলা শেখাও—

দিনের পর দিন তাদের উত্তেজনাময় কৌতূহল দেখে আমার শরীরে শুধু

রোমাঞ্চ জেগেছিলো। ভালো করে কোনো কথা বুঝিয়ে বলতে পারি নি—ভয় ছিলো পাছে নিজেদের কলঙ্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেমন করে তাদের বলবো, যে বাঙালী ভালো ইংরেজী জানে, ভালো ইংরেজী লেখে সে নিজে লেখক না হলেও নিজের কাঁচা লেখাই ইংরেজীতে প্রকাশ করে। একবারও ভেবে দেখে না বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে—সে গৌরব শুধু তার একার নয়, লেখক বিশেষেরও নয়—তার সমগ্র দেশের।

ইংল্যাণ্ডের গ্রাম

সহসা এক সময় চোখ মেলে দেখি এপ্রিলের গন্ধহীন রঙ-বেরঙের অজস্র ফুল ভরে উঠেছে চারপাশে। তবু আজও থেকে থেকে ঝরে পড়ে হিম, আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাতায় ফুলে কাঁপে মৃদু শিশির। এতো দীর্ঘদিন কঠিন শীতের ভারী আবরণ যেন পিষে রেখেছিলো প্রকৃতির এই সৌন্দর্য-বিন্যাস আর আজ মুহূর্তে সরে গেলো সে-পাথর। তাই ঋতুর এই পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে—খেয়াল না থাকলেও বাহির-বিশ্ব বলে যায় বসন্ত এসেছে আর অকারণে মনের নিভৃতে শুনি কিসের অনুরণন। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই, রবিন পাখিকে দেখি আর গন্ধহীন ফুলগুলি কিসের যেন গন্ধ ছড়ায়।

তারপর গ্রীষ্ম আসে। প্রকৃতি যতো তুষার ঝরায়, ততো রোদ্দুর বিলোয় না কোনোদিন। হোক স্তিমিত ক্ষণিকের রোদ—তাই সবাই প্রাণ ভরে লুটে নেয়। এমনি সোনা-ঝলা হালকা রোদ্দুরে দেখেছি গ্রাম,— লণ্ডনের আশেপাশে ইংল্যাণ্ডের অনেক ছোটো ছোটো গ্রাম।

সেই এপ্রিলের ফোটা ফুলগুলি অজস্র আলো পেয়ে হঠাৎ যেন আনন্দে দুলে দুলে উঠছে। পথের ধারে ধারে পুরানো এক ধরনের একতালা বাড়ি—সামনে ফল-ফুলের বাগান। মুখে পাইপ, মাথায় গরম কাপড়ের টুপি,—বাড়ির কর্তাকে চিনতে ভুল হয় না। ছুটির দিনে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বাগানের কাজ করছে। আর একটু এগিয়ে পথের আর-একধারে অন্য বাড়ির উঠোনের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই মাত্র অনেক কাপড় কেচে গিন্নী বালতি ভরে নিয়ে এসেছে,—এইবার একে একে শুকোতে দেবে। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে কিংবা খালি গায়ে মাঠে গড়াগড়ি যেতে যেতে ভোগ করছে কচি রোদ্দুর। নির্জন টানা পথে ঠুক ঠুক করে চলেছে বুড়ো সব্জিওলা আর থেকে-থেকে এক সুরে হেঁকে উঠছে, কলিফ্লাওয়ার—গ্রীন পী—জ।

ডাক শুনে বাড়ির গিন্নী গেটের কাছে এগিয়ে এসে হেসে বলছে, গুডমর্নিং, কি আছে তোমার গাড়িতে?

কি চাই তোমার ম্যাডাম? গাড়ি থামিয়ে সব্‌জিওলা টাটকা তরিতরকারি গিন্নীকে দেখিয়ে, কপি দেবো? ভালো মটরশুঁটি? শস্তা ক্যারট? গিন্নী এটা-ওটা ঘেঁটে সামান্য দরাদরি করে ঝুড়ি ভরে কিনে রাখছে নানারকম তরিতরকারি আর হিসেব করে মৃদু হেসে মিটিয়ে দিচ্ছে সব্‌জিওলার পাওনা দাম। আরও এগিয়ে দেখা যায়, দলে দলে বুড়ো-বুড়ী, ছেলেমেয়ে হয় ফাঁকা জায়গায় ছুটোছুটি করছে, নয় টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে খেলতে চলেছে কিংবা স্যুইমিং কস্ট্যুম পরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তারপর আর বাড়ি চোখে পড়ে না। মাঠ আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে সুদূর নির্জন পথ। সাপের ভয় নেই, তাই নিশ্চিন্তে এই ঝোপ-ঝাড়ে বসা যায়। নরম মাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাতার মর্মর আর হাওয়ার অলস মৃদু স্পর্শ মনের আশ্চর্য শৈথিল্য দিয়ে উপভোগ করা যায়। সামনে বিরাট জলাশয়, মাথার ওপর খোলা আকাশ, চারপাশে সবুজ ঝোপঝাড় গাছপালা। কিন্তু সে সবুজ, মনকে তো তেমন করে স্পর্শ করতে পারলো না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু মন বলছে, এই সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা লুকিয়ে আছে, আর যেন বয়ে গেছে ধোঁয়ার ঝড়। তার চিরকালের চিহ্ন পড়েছে সবুজের ওপর। তাই মনে হয়, সবুজ নয়—এ যেন ধূসর। ততো পাখি ডাকে না, ততো মাটির গন্ধ পাওয়া যায় না, বাতাস বহন করে আনে না দিশাহারা সৌরভ। প্রকৃতির কোথায় যেন ভয় লুকিয়ে আছে।

কী সুন্দর দিন! পথিকের সম্ভাষণে হঠাৎ কখন চমক লাগে।

সুন্দর!

তোমাকে তো এ গ্রামে আগে দেখিনি মেট?

আমি বেড়াতে এসেছি।

মাঝবয়সী পথিক একচোট হেসে বলে, বেড়াতে? এই পাড়াগাঁয়ে? কী দেখবে বল এখানে?

তোমাকে আর তোমার মতো আরও অনেককে।

বাঃ, সুন্দর কথা বলতে পারো তো তুমি, বাড়ি কোথায় তোমার—স্পেইন?

না।

তবে?

তুমিই বল না, কোথায় হতে পারে?

আবার হেসে বলে পথিক, এইবার ঠিক বুঝেছি, ফ্রান্সের লোকেরা এমনি রসিক হয় বটে।

আমিও হেসে বলি, হলো না, হলো না—আমার বাড়ি ইণ্ডিয়া—নাম শুনেছো?

আরে তাই নাকি? আমার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে পথিক বলে, গান্ধী—গান্ধী—গান্ধী—তোমাদের দেশের কথা খুব শুনেছি—লণ্ডনে পড়াশুনো করছো বুঝি?

হ্যাঁ।

বাঃ, আমি পোস্টম্যান, ওই যে আমার বাড়ি, একদিন এসে চা খাবে? খুব খুশী হবো—

নিশ্চয়ই।

তুমি তো শহরে লোক, জুতোয় পাইপ ঠুকে পথিক আবার বলে, আচ্ছা, বল তো কী আছে তোমাদের শহরে? শুধু ধোঁয়া আর যক্ষা।—না বাপু, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আর শহরের নিন্দে করবো না। ক'দিন থাকবে?

দিন সাতেক।

এসো পরশু চা খেতে।

নিশ্চয়ই আসবো, অনেক ধন্যবাদ।

কেউ রেলের গার্ড, কেউ পোস্টম্যান, কেউ চাষা, কেউ গয়লা আর কেউ সামান্য ইস্কুল মাস্টার। এদেরই বাড়িতে রেডিও, পিয়ানো আর ভালো জাতের কুকুর দেখে প্রথমে অবাক লাগে আমাদের। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে এদের অসন্তোষ।

যাদের কথা বললাম, আমাদের দেশের তুলনায় তাদের অবস্থা অনেক ভালো

হলেও নিজেদের দেশের আয়-ব্যয়ের হিসেবে এদের অবস্থা খারাপই বলা যায়। রেডিও, পিয়ানো, কার্পেট আর শীতের দেশ বলে জানলায় পুরু পর্দা প্রায় সব বাড়িতেই থাকে। সপ্তাহে খুব অল্প টাকার কিস্তিতে ওগুলো কেনা যায়। কিন্তু টান পড়ে দৈনন্দিন সংসার-খরচের বেলায়। খাওয়া-দাওয়া আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের তুলনায় একজন সাধারণ পিওন বা ইস্কুল-মাস্টারের আয় কমই বলা যায়। একজন পোস্টম্যানের মাইনে সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড। তার বাড়িভাড়া, র‍্যাশন, লণ্ড্রি, জামাকাপড়, শীতের দেশের আরও টুকিটাকি জিনিস খুব সতর্ক হয়ে কিনলেও ওই মাইনেতে স্বচ্ছল অবস্থায় সংসার চলতে পারে না তার। কোনো রকমে চলে। আমাদের মতো খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। ভোজন-বিলাসে তাদের উৎসাহ নেই,—রন্ধন শিল্পের বিভিন্ন নৈপুণ্য ইংরেজের একেবারে অজ্ঞাত। সেই আলুসেদ্ধ, কপি সেদ্ধ, আর রোস্ট আর একঘেয়ে মাছ সেদ্ধ কিংবা ভাজা। গ্যাসের উনুনে ঘণ্টাখানেকের বেশি রান্না করতে লাগে না। ইংরেজ-গৃহিণী তার বেশি সময় কাটায় না রান্নাঘরে। আয়েস করে তাদের খেতে দেখেছি, তা সে যাই হোক—মন্দ হোক ভালো হোক—ক্ষতি কিছু নেই। যা খাওয়ানো যায়, খুশী হয়ে খেয়ে বলে, সুন্দর! সকালে ব্রেকফাস্টের পর একটায় লাঞ্চ খেলো, তারপর বিকেলে সামান্য একটু চা, সাড়ে ছটা সাতটায় গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

হয়তো রেডিও কেনবার ইচ্ছে হলো কারুর,—ওদিকে কিস্তিতে সামান্য টাকা দিলেও সংসার-খরচে টান পড়ে। তখন নিয়ম করে হয় লাঞ্চ একেবারে বাদ দিয়ে নয় ব্রেকফাস্ট কমিয়ে দিয়ে ওরা দুই দিক বজায় রাখে। ধার করতে হলো না, সংসার খরচের অকুলান হলো না, অথচ ইচ্ছেমতো জিনিসও কেনা হলো। গ্রামে হোক, শহরে হোক ধৈর্যশীল হিসিবী ইংরেজদের সেই এক রীতি।

আমাদের গ্রামে পিপাসা চেপে চলতে চলতে সুন্দর করে সাজানো কচি ডাবের দোকান দেখলে যেমন আনন্দ হয়, ঠিক তেমনি আনন্দ হয় ইংল্যাণ্ডের গ্রামে 'পাবলিক হাউস' (পাব্) দেখলে। গ্রীষ্মের দুপুরে দল বেঁধে

সাইকেলে কিংবা পায়ে হেঁটে এলো ছাত্র-ছাত্রী—তারা এসে বিশ্রাম করলো 'পাবে'—ঠাণ্ডা বিয়ার কিংবা লেমন-স্কোয়াস খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যেবেলা 'পাব্' ভরে যায়। আর চলে বুড়োদের মনের কথা, বুড়ীদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত তরুণ-তরুণীর মন জানাজানি।

কি হে, ফেস্টিভ্যাল অব ব্রিটেন কেমন দেখলে? শহরে গিয়েছিলে বুঝি?

যাই বল, এমন উৎসব কখনও দেখি নি হে—

আরে দূর, উৎসব—টিকিটের দাম বড়ো বেশি।

তা হবে না, খরচটা কি কম হয়েছে নাকি?

দেশের এই দুঃসময়ে এতো খরচ করবার কি দরকার ছিল?

ছিল বৈকি, দুঃসময় হলেও, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা অনেক ভালো, সেটা বাইরের লোকের জানা দরকার—

থামো, থামো, যাদের জানবার তারা আমাদের আসল অবস্থার কথা জানে।

যতোই জানুক, এটাও তাদের জানা দরকার, আমাদের অবস্থা আশেপাশের অনেক দেশের চেয়ে অনেক ভালো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেকথা এখন খুব খরচ-পত্তর করে জাহির না করে আর উপায় কি!

আঃ, ছেড়ে দাও ওসব কথা, বলি ব্যালে-ট্যালে দেখলে নাকি ফেস্টিভ্যাল হল্-এ?

না বাপু, ঢুকতে পাঁচ শিলিং, তারপর আরও খরচ করে ব্যালে-দেখা গ্রামের লোকের পোষায় না।

'হল্'টা করতে বেশ খরচ পড়েছে, কিন্তু বানিয়েছে চমৎকার, আর ওটা তো থাকবে চিরকাল।

তা থাক। কিন্তু পাঁচ শিলিং খরচ করেও ভেতরে ঢুকে যে দুটো ভালো-মন্দ খাবো, তার উপায় নেই—রেস্টুরেন্টগুলোর খাবারের যা দাম!

যাই বলো বাপু, বড় বাড়াবাড়ি রকম বেশী দাম করা হয়েছে ওখানকার সব জিনিসের!

কি মিসেস টার্নবুল, 'পাব্' কেমন চলছে তোমার ?

ধন্যবাদ, এই মন্দ নয়—

মেয়ের কি খবর ?

লণ্ডনে ইস্কুল-মাস্টারি করছে, দিনকয়েক হলো পুরোনো ইস্কুলটা বদলেছে।

নাকি ? আরও ভালো ইস্কুলে গেছে বুঝি ?

কে জানে ছাই সেকথা। আমার স্বামীর হাতে গড়া 'পাব্', ভেবেছিলাম মেয়েটাই এটা বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু গ্রামে বসে 'পাব' চালানোয় তার এতোটুকুও উৎসাহ নেই, মুখ বেঁকিয়ে আমাকে শুনিয়ে গেল সেদিন, এই নোংরা ব্যবসা চালাতে বয়ে গেছে আমার—

বটে ?

মরুক গে, যার যা খুশি করবে, আমি যে কদিন বাঁচি এটা চালিয়ে যাবো, তারপর যা হয় হবে। আমি যখন থাকবো না, তখনকার ভাবনা ভেবে আমার লাভ কি বল ?

ঠিক কথা মিসেস টার্নবুল।

ওহে, ওই আবার এসেছে—

কে আবার এলো হে ?

ওই দেখ না তাকিয়ে—

ও, সেই শাশুড়ী বউ আর ছোকরাটা। ওরে বাপরে—

আচ্ছা, ওরা কারা হে ?

কে জানে, ওই পাদ্রীর বাড়িটা কিনেছে, পাদ্রী বাছাধন প্রেমে হতাশ হয়ে চাকরি নিয়ে গেল ক্যানাডায়, আর ওরা দখল করলো ওর বাড়ি। ওই মেয়ে আর শাশুড়ী থাকে, শাশুড়ী বিধবা, মেয়েটির স্বামী নাকি ফিলিম্ করতে গেছে আমেরিকা, হিরো হবে হে, কান কাটবে ওয়ালটার পিজনের—সে আর এসেছে বউএর কাছে—

তাই বুঝি আমেরিকা থেকে এই ছোকরাটা এসে জুটেছে ?

দূর—নেশা ধরেছে তোমার দেখছি, ইংরেজ হয়ে ইংরেজ চিনতে পারো

না—ও ছোঁড়া আবার আমেরিকান হলো কবে—ও তো আমাদের হেড-মাস্টারের ভাই—

আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে—

আরে বসো বসো—খাও আরেকটা বিয়ার।

অল্‌রাইট।

কখনও কখনও মোটরের হর্ন শুনে চমক লেগেছে। পিছন ফিরে দেখি দামী বিলিতি গাড়ি চালিয়ে লণ্ডনে চলেছে ইংরেজ ব্যবসায়ী। হয়তো শহরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তার, তাই লণ্ডনের কাছাকাছি গ্রামে উঠেছে তার বিরাট বাড়ি। সামনে পিছনে অনেক জমি—সদর দরজা খুলে ঘরের কাজ করছে জার্মান কিংবা সুইস্ মেইড। অনেক ছোট ছোট বাড়ির কাছে এমনি বিরাট বাড়ি বড়ো বেশী বেমানান মনে হয়—এ যেন জোর করে অনধিকার প্রবেশ করে নিদারুণ ছন্দপতন করে দেয়া।

পরমুহূর্তে'ই চোখ জুড়িয়ে যায়—খোলা মাঠে চরছে গরুর পাল। আহা, কতোদিন দেখিনি যে! লণ্ডনের রাস্তায় তো আর গরু দেখা যায় না। বড়ো বড়ো তাজা অস্ট্রেলিয়ান গরু। এদেরই দুধ খেয়ে বড়ো হচ্ছে, সুন্দর হচ্ছে অসংখ্য ব্রিটিশ শিশুর দল। ভেজাল নেই—এক ফোঁটা জল নেই—ইংল্যাণ্ডের খাঁটি গরুর-দুধ। এ গ্রামেই রয়েছে কোনো ডেয়ারি ফার্ম। দীর্ঘকালস্থায়ী গোধূলি শেষ হবে না, গগনে উঠবে না গো-ক্ষুর রেণু, 'চাঁদমুখে বেণু দিয়া ধেনু নাম লইয়া'ও ডাকবে না কেউ, পাঁচটা বাজবার আগেই চোদ্দ-পনেরো বছরের কয়েকটি ছেলে এসে নিঃশব্দে ডেয়ারির গোয়ালে নিয়ে যাবে গরুর পাল। কাল খুব ভোরে—হাতের স্পর্শ নয়—বৈদ্যুতিক প্লাগ লাগিয়ে শুরু হবে দোহন, তারপর বিদ্যুৎ দিয়ে শোধন! কতো অসংখ্য ছোট-বড় বোতল ভরে উঠবে। তারপর বিরাট ঘোড়ায় টানা গাড়ি হাঁকিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়বে গয়লার দল। গ্রামে, শহরে আর লণ্ডনের অলিতে-গলিতে শোনা যাবে দোরগোড়ায় বোতলের ঠুন ঠুন শব্দ।

যতো দেখেছি, ততো দেখাতে পারলাম না। যতো কথা বলবো বলে মনে মনে সাজিয়ে তুলেছিলাম, ততো কথা বলা হলো না। সময় আর সমুদ্রের ব্যবধান নিঃশব্দে কখন দিয়ে গেছে বিস্মরণ। স্মরণের সরোবরে ফুলের মতো শুধু ফুটে রইলো সিন্ধুপারের সুদূর পল্লীঅঞ্চলের হাল্কা রোদ্দুর ঝলমল করা কয়েকটি উজ্জ্বল দিন। তাই হোক সঞ্চয়।

* * * লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ * * *

সমস্ত লণ্ডন শহরে রঙ্গালয়ের সংখ্যা কত, সেকথা মনে মনে হিসেব করে সহজে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে ওয়েস্ট এণ্ডে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার এপাশে ওপাশে অলিতে গলিতে এত রঙ্গালয় চোখে পড়ে যে, বিদেশীর পক্ষে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লম্বা 'কিউ'-এর দিকে তাকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া অন্য পাড়ায় ছোটখাটো থিয়েটার তো আছেই। নতুন লেখকের ভালো নাটক কিংবা পুরানো লেখকের নতুন বই প্রথমে ওয়েস্ট এণ্ডের থিয়েটারেই দেখা যায়। সে-পাড়ায় অভিনয় দেখার আগ্রহ লণ্ডনের জন-সাধারণের খুব বেশি। লোকে 'কিউ'-এ দাঁড়ায় দু শিলিংএর টিকিটের জন্য—সবচেয়ে কম দামী টিকিট। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা তুষার—কিছুতেই উৎসাহ হারায় না তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে এতটুকু বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। এই দু শিলিংএর 'কিউ'-এ যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খুব ভালো নয়, সেকথা বললে ভুল হবে। ইচ্ছে করলে এদের অনেকেই পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট দুমাস আগে কিনে রাখতে পারতো। কিন্তু তা করে নি, কেননা, 'কিউ'-এ দাঁড়াতে এদের ভালো লাগে আর যেখানে কম পয়সায় কাজ সারা যায় সেখানে বেশি পয়সা ইংরেজ সহজে খরচ করে না। আজ ইচ্ছে করলেও ফল হবে না, কারণ অন্য টিকিট সব শেষ হয়ে গেছে। তাই যারা বিদেশী কিংবা যাদের বয়স খুব বেশি অথবা খুব বড়লোক, তারা আগে থেকে দামী চেয়ারের বন্দোবস্ত করে রাখে।

যারা অশিক্ষিত, নাটকের ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাদের নেই, যারা চায় শুধু বিশেষ পোশাকে বিশেষ নাচ আর আনন্দ, সেই 'পাবলিকে'র দোহাই দিয়ে ওয়েস্ট এণ্ড রঙ্গালয়ের কর্তারা বিশেষ নাটকের বন্দোবস্ত করবে না, কিংবা কোন নাট্যকার তাদের খুশী করবার জন্যে নিজের অক্ষমতা

অস্বীকার করে কখনো বলবে না, 'পাবলিক' এই চায়। ইংরেজ নাট্যকারের কাজ হলো দেশের রুচিকে উন্নত করা—নাট্য-সাহিত্যে নতুন আলো ফেলে নানারকম পরীক্ষা করা। হীন রুচিকে সমর্থন করে শুধু পেটের দায়ে নাটক লেখা নয়। তাই লণ্ডনের রঙ্গালয়ে শিক্ষিত দর্শকের ভিড়—ছাত্রদের ঠেলাঠেলি। অভিনয় কেমন হলো, কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করলো, সেকথা দর্শক আলোচনা করে পরে—সাধারণত থিয়েটার দেখতে দেখতে কিংবা বাইরে বেরিয়ে প্রথম কথা হবে, নাট্যকারের দোষগুণ নিয়ে, নাটকের বিষয়বস্তু আর কলাকৌশল নিয়ে। তবু বিশেষ দর্শকের জন্য বিশেষ নাচ-গানের রঙ্গালয় আছে এবং ওয়েস্ট এণ্ডেই। আমি সেগুলির কথাই প্রথমে বলবো। সে-কর্তারা হাল্কাভাবে হাল্কা রস পরিবেশন করে। ওয়েস্ট এণ্ডের তিনটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়—উইণ্ডমিল, ক্যাসিনো, হিপোড্রোম্। ভদ্রসমাজে যদি হঠাৎ কোনোদিন আপনি এই রঙ্গালয়গুলির নাম উল্লেখ করেন, তাহলে শিক্ষিত শ্রোতা তখুনি বুঝে নেবে, আপনার রুচি কেমন এবং আপনি কোন শ্রেণীর লোক। এই রঙ্গালয়-গুলিতে আনন্দ উপভোগ করতে যায় সকলেই, কিন্তু চুপে-চুপে, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে—চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললেই মুশকিল। মনে করবে, কী জঘন্য রুচি, উইণ্ডমিলে এসেছে।

এই জাতের থিয়েটারগুলির বড়ো বেশি মিল। একটি দেখলেই চলে—অন্যগুলিতে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা কি? যতটুকু কাপড় না হলেই চলে না, ঠিক ততটুকু কাপড় পরে মেয়েরা নাচ আর গানের মধ্য দিয়ে আপনাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু নাচের ভঙ্গী দেখে আর গানের ভাষা শুনে শিক্ষিতেরা ভুরু কোঁচকায়, অনেকেই উঠে যায়, আর যে সব বৃদ্ধেরা লোভ সামলাতে না পেরে এসে পড়েছে, তারা বিরক্তির রেখা মুখে ফুটিয়ে শেষ অবধি বসে থাকে। মেয়েরা এসব থিয়েটারে বড়ো একটা আসে না, আর দু-একজন কৌতূহল দমন করবার জন্যে এলেও দ্বিতীয়বার আর ভুলেও আসে না।

ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবের মুখে এই সব থিয়েটারের যতখানি নিন্দে শুনেছিলাম—এগুলি বার বার দেখার পর আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

ইংরেজ কনজারভেটিভ—একটু এদিক-ওদিক হলে লজ্জায় তাদের কান লাল হয়ে ওঠে। সামান্য অশোভন হলে অশ্লীল মনে করে অস্বস্তি বোধ করে। উল্লিখিত রঙ্গালয়ে বসে আমার একবারও মনে হয় নি যে, এতোটুকুও বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর মঞ্চের মেয়েদের পোশাক দেখে আমি অবাক হই নি, কারণ এমন সাজ যে কোন ব্যালেতে দেখা গেছে। তারপর তাদের গান ও রসিকতা। হয়তো এই নিয়ে শিক্ষিত ও মার্জিত দর্শকের আপত্তি। কিন্তু আমি বিদেশী, তাই ওদের রসিকতা ও হাস্যরসের জাতবিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। আলোর বন্যা, মঞ্চের কলাকৌশল, মেয়েদের সমাবেশ, আর তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন বাজনার আশ্চর্য সঙ্গতি আমাকে বিস্মিত করেছে। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে, বাইরে বেরিয়ে আমার মনে হয়েছিলো, কী দেখলাম! সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন এসব কথা ভাববার আমার অবসর হয় নি, কারণ মঞ্চের বিচিত্র শিল্প-প্রকাশ আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো।

এই সঙ্গে এই জাতের ফরাসী দলের নাম উল্লেখ করতে হয়, অর্থাৎ 'ফলিবেরজা'। সম্প্রতি লণ্ডনে তাদের শাখা খোলা হয়েছে এবং এই দল লণ্ডনের অন্য তিনটি থিয়েটারকে কানা করে দিয়েছে। ফ্রান্সের রূপসীরা ম্লান করে দিয়েছে ইংরেজ সুন্দরীদের। আর ফরাসী স্টেজ-টেকনিক দেখে মনে হয়, ইংল্যাণ্ড কত পেছিয়ে আছে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অপূর্ব!

অল্প অল্প আলো, যেন ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে, মঞ্চের ওপর জমেছে মেঘ, মৃদু মৃদু বাজনা বাজছে. আর সেই মেঘে মেঘে কতো রূপসীর ভিড়—কতো রকমের রূপ প্রকাশ। তারপর অন্য বাজনা বাজলো, আলোর প্লাবনে ভরে গেলো মঞ্চ, আকাশ থেকে কেমন করে নেমে এলো হাজার সুন্দরী। কখনও সমুদ্রের গভীরে জলপরীদের নাচ, কখনও আকাশের রূপে, কখনও মঞ্চের ওপর রেলগাড়ি আপনাকে অবাক করে দেবে। এই ধরনের মঞ্চগুলির মধ্যে বর্তমান লণ্ডনে ফরাসী 'ফলিবেরজা' সর্বশ্রেষ্ঠ, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যাদের রুচি উন্নত, যারা নাচ-গান ভালোবাসে, অথচ যারা এই সব রঙ্গালয়ে

গিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হয় না, তাদের জন্য রয়েছে কভেণ্ট গার্ডেন অপেরা কিংবা শ্যাডলারস ওয়েলস ব্যালে। পুরাণ কিংবা ইতিহাস নিয়ে এরা করে গানের নাটক কিংবা নাচের অভিনয়। তাছাড়া সমগ্র ইওরোপ থেকে আসে নানা দল। স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন—এই সব অনেক দেশের ব্যালে লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চ আচ্ছন্ন করে রাখে বহুদিন। কেনসিংটনের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল অ্যালবার্ট হলে নানা দেশের কনসার্ট চলে রাতের পর রাত। নাচ নয়, গান নয় অভিনয় নয়, শুধু কনসার্ট—সেই বাজনা শুনতে সহস্র শ্রোতার ভিড়।

এবার লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চের আধুনিক নাটক ও নাট্যকারের কথা বলা যাক। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের তরুণতম শক্তিশালী নাট্যকার ক্রিস্টফার ফ্রাই। ফ্রাই-এর বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচে। তাঁর নামে দর্শক টেনে আনে। তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার বর্তমান ইংল্যাণ্ডে নেই। অনেক ইংরেজ সমালোচক ক্রিস্টফার ফ্রাইকে বলে আধুনিক শেক্সপীয়র। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, দি লেডী ইজ নট ফর্ বার্নিং। এই নাট্যকারের প্রত্যেকটি নাটক রাতের পর রাত লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চে চলেছে এবং দর্শকসাধারণের মন জয় করে নিয়েছে। তাঁর আরও কয়েকটি নাটকের নাম, দি ফার্স্ট বর্ন্ ভিনাস্ অবজারভ্ড্ এবং এ ফিনিক্স টু ফ্রিকোয়েণ্ট।

ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর নাটক শুধু দর্শকের মন মাতায় না, পাঠককেও গভীর তৃপ্তি দেয়। তাঁর ভাষা যেমন ভারী, তেমন অভিনব। ফ্রাই-এর লেখা পড়ে মনে হয়, তার প্রেরণা ইতিহাস আর বাইবেল থেকে। ছন্দের ঝঙ্কারে, উপমার নতুনত্বে, দৃষ্টির ব্যাপকতায় তাঁর নাট্য-সাহিত্য শিল্পের সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁচেছে। তাই আজ অনেক সমালোচকের মতে তরুণ ক্রিস্টফার ফ্রাই আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার।

কবি টি. এস. এলিয়টের তৃতীয় নাটক 'ককটেল পার্টি' লেস্টার স্কোয়ারের নিউ থিয়েটারে আরম্ভ হয়। কবি এ-নাটক শেস করবার আগেই অনেকে এর কথা জানতো এবং কবে এটি শেষ হবে, একথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। নাটক লেখা শেষ হলো, কিন্তু লণ্ডনে অভিনীত হলো না—এডিনবরা উৎসবে

হলো এ নাটকের প্রথম অভিনয় তারপর ব্রাইটনে এবং অবশেষে লণ্ডনে। অনেকের ককটেল পার্টি ভালো লাগে নি। তারা বলেছে, এ নাটকে নাকি কিছু নেই। আর কারুর কারুর মতে, অদ্ভুত নাটক। ককটেল পার্টি চললো অনেকদিন—এলিয়টের ভাব আর ভাষা আবার লোককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো তাঁর ক্ষমতার কথা। এ নাটকে অভিনেতা ও অভিনয়ের কথা কেউ উল্লেখ করলো না। ককটেল পার্টি সম্পর্কে একমাত্র আলোচনা হলো, এলিয়ট।

ফ্রাই ও এলিয়ট ছাড়া আলডুস হাক্সলি, জে. বি. প্রিস্টলি—এঁরাও রঙ্গমঞ্চের জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে নতুন নাটক লিখে নানা রকম পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁদের নাটক হলেই দর্শক-সাধারণ বিনা দ্বিধায় টিকিট কাটে। কিন্তু এঁদের নাটক দেখে বাইরে এসে লোকে আগে অভিনয়ের আলোচনা করে—পরে নাটকের বিষয়বস্তুর কথা। বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর তাঁর বহু নাটক আবার নতুন করে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। ভিড় হচ্ছে খুব বেশি, টিকিট পাওয়া শক্ত। লোকে হাততালি দিয়ে ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের মতো দীর্ঘ নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঠায় চেয়ারে বসে উপভোগ করছে।

আর ঘরে বাইরে শেক্সপীয়র। সারা বছরের যে কোন সময় লণ্ডনের কোন না কোন রঙ্গমঞ্চে আপনি শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে পাবেন। ওল্ড ভিক্ কোম্পানি ছাড়াও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তার নাটক নানাভাবে অভিনীত হয়। স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনের কথা এখানে না হয় নাই উল্লেখ করলাম।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো খোলা মাঠে শেক্সপীয়র। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে রিজেন্টস পার্কে শেক্সপীয়রের নানা নাটক অভিনয় করা হয়। ওপেন্ এয়ার থিয়েটারের অভিনয় প্রত্যেকের ভালো লাগে—সকলে বার বার দেখেন। বছরে শুধু দু'মাসের জন্যে তাদের আবির্ভাব, তাই দর্শকের সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।

'যাত্রা' কথাটা শুনলে আজকাল আমরা সকলেই মনে মনে হাসি। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াছবির যুগে যাত্রা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা দেশবাসী করলো

না, করতে পারলো না। ইংল্যাণ্ড পারলো। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু রীতিনীতি বদলাতে হলো ; কিন্তু অভিনয় মালঞ্চের প্রথম ফুল তারা বাঁচিয়ে রাখলো সযত্নে। আমার এ উক্তিতে হয়তো পাঠক-সাধারণ অবাক হবেন। কিন্তু ওপেন এয়ার থিয়েটার আমাকে এবং আরও অনেককে নিয়ে যায় শেক্সপীয়রের যুগে। যেমনি অভিনয় তেমনি প্রকাশের ধারা। আর আশ্চর্য, যে কোনো আধুনিক থিয়েটারের চেয়ে ওপেন এয়ারে ভিড় হয় অনেক বেশি।

আজও শেক্সপীয়রকে সাধারণের কাছে নানারূপে তুলে ধরবার জন্তে ইংল্যাণ্ড যতখানি চেষ্টা করছে আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশে তাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে ততো মাতামাতি হয়।

কিন্তু সার্থক এ মাতামাতি। 'জুলিয়াস্ সিজার' স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনে দেখলাম একরকম, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখলাম আর একরকম, সেই একই নাটক ওপেন এয়ারে দেখলাম একেবারে অন্যরকম।

বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে বলে, শুনেছি ইংরেজের মুখে শেক্সপীয়র ছাড়া নাকি কথা নেই, তাই ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আমাদের দেশের লোকেরাও শেক্সপীয়র-শেক্সপীয়র করে ইংরেজ সাজে।

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। ইংরেজ সাজে কিনা জানি না, তবে একথা ঠিক আমাদের দেশের লোকের ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে হয় নতুন উপলব্ধি। আর এই মহাকবিকে এমন করে বিদেশীর মনে মেলে ধরবার কৃতিত্ব বোধ হয় অভিনেতা অভিনেত্রী আর রঙ্গ-জগতের অন্যান্য লোকের প্রাপ্য। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিলো।

শুধু ইংরেজী নাটক নয়, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে ইংরেজীতে ইওরোপের আরও নানা দেশের নাটক প্রায়ই অভিনীত হয়। আর তা ছাড়া আমেরিকার নাটক তো থাকবেই। সব দেশের সব নাটক দেখবার সুযোগ আমার হয় নি, আমি শুধু ফ্রান্স ও আমেরিকার নাটকের কথাই বলবো, কেন না এই দুই দেশের নাটকের মূলে আশ্চর্য প্রভেদ—অভিনয়েও।

ফরাসী নাট্যকার জঁা পল সারত্রের (Jean Paul Sartre) নাম ইংল্যাণ্ডে শুধু সুপরিচিত নয়, প্রশংসিত। তার লেখা 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ', 'এ রেসপেক্টেব্‌ল্‌ প্রসটিটিউট' এবং আরও অনেক নাটক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে চলেছে এবং তার নতুন রচনার আশায় জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সারত্রের দর্শন একজিস্‌টেন্‌সিয়েলিজ্‌ম্‌ (অস্তিত্ববাদ)। সারত্রের নাটক এই 'বাদে'র ওপর ভিত্তি করে লেখা। গতি, কৌতূহল, রস—সবই আছে তার নাটকে এবং শক্তিশালী নাট্যকারের যে গুণগুলি থাকা দরকার জঁা পল সারত্রে সেগুলি থেকে বঞ্চিত নয়, তবু কোথায় যেন একে প্রশংসা করতে বেধে যায় আর মনে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আর একজন ফরাসী নাট্যকার জঁা অ্যানুই ইংল্যাণ্ডে সারত্রের মতো পরিচিত না হলেও তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী বলে স্বীকৃত। অ্যানুই-এর অনুভূতি ও সমবেদনা সারত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ আর গভীর। জনসাধারণ তাকে নিয়ে উন্মত্ত না হলেও ফরাসী ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত মহল সারত্রের চেয়ে অ্যানুই-এর প্রতিভা বেশি সেকথা স্বীকার করে।

কিছুদিন আগে অ্যানুই-এর 'অ্যান্টিগোনে' ডাচেস্‌ থিয়েটারে হয়েছিলো। ফ্রান্সে এই অসামান্য নাটক নাকি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো; কিন্তু লণ্ডনে চললো না। ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর অনুবাদ করা অ্যানুই-এর নাটক 'রিং রাউণ্ড দি মুন' গ্লোব থিয়েটারে খুব ভালো চলেছিলো। নাটকের শেষের দিকে নাট্যকারের মতামত, সম্পদের অসারতা ইত্যাদি জোর করে উপদেশ শোনাবার মতো মনে হলেও নাটকের গঠন ও সুঅভিনয়ের জন্যে এসব কথা লোকের মনে হয়তো ওঠে নি। 'রিং রাউণ্ড দি মুন' সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অভিনেত্রী মারগারেট রাদারফোর্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অ্যানুই-এর আর একটি প্রশংসিত নাটকের নাম 'পয়েন্ট অফ্‌ ডিপারচার'। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে তিনখানি উচ্চপ্রশংসিত আমেরিকান নাটক—'হার্ভি' 'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' আর 'স্ট্রীটকার নেম্‌ড্‌ ডিজায়ার'।

'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' প্রসিদ্ধ হয়েছে পল মুনির অভিনয়ের জন্যে। এ নাটকের বিষয়বস্তু হলো সেল্‌স্‌ম্যানের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা। 'হার্ভি'

মনস্তত্ত্বমূলক। 'স্ট্রীটকার্ নেম্ড্ ডিজায়ার'-এর লেখক বর্তমান আমেরিকার জনপ্রিয় নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্‌স্। যে তিনখানি আমেরিকান নাটকের নাম করলাম তার প্রত্যেকটি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বহুদিন চলেছে এবং অনেক ইংরেজ দর্শক এগুলি নিয়ে মেতে উঠলেও স্বীকার করেছেন যে তাদের মনে নাটকের বিষয়বস্তু ফরাসী নাটকের মতো গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। 'স্ট্রীটকারে' ভিভিয়েন্ লি-র অভিনয় খুবই ভালো; কিন্তু টেনেসি উইলিয়াম্‌স্-এর রচনা তাদের ভালো লাগে নি। 'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' তবু কিছু রেখাপাত করেছে। পল মুনির অভিনয় নৈপুণ্য না থাকলে এ নাটকের কি পরিণাম হতো বলা কঠিন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে ছাড়ে নি, পল মুনি মাঝে মাঝে বড় মেলোড্রামাটিক অভিনয় করেছে, আমেরিকান অভিনেতা হলে যা হয়। আর কেউ কেউ (বিদেশী দর্শক) মরবিড্ বলতে ছাড়ে নি। 'হার্ভি' একটি খরগোসের নাম। নাটকের নায়ক অভিনেতা জো ব্রাউন সব সময় মনে করতো একটি খরগোস তার পাশে পাশে রয়েছে। অবশেষে নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নায়কের মনের এ অবস্থা দূর করা হলো। সাধারণের মতে এ নাটক গভীর কিছু না হলেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যায়। এমন কি অভিনয়ের শেষে জো ব্রাউন দর্শক সাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলো, আমেরিকায় হাজার হাজার রাত আমি এ নাটকে অভিনয় করেছি; কিন্তু লণ্ডনের দর্শকদের মতো এমন প্রাণময় অভ্যর্থনা সেখানে পাই নি।

ইংল্যাণ্ডে আমেরিকান নাটকের চেয়ে ফরাসী নাটক বেশী প্রিয়। যা স্বাভাবিক যা সঙ্গত তাই নিয়ে ফরাসী নাটক এবং সেই কারণে অভিনয়ও সংযত। ফরাসী নাটকে দেখি সাধারণ মানুষের ভিড়, তারা আমাদের যেন একান্ত আপনার। তারা কথা বলে সাধারণ মানুষের মতো তাদের সব কিছুই আমাদের বড়ো চেনা। আর আমেরিকান নাটকে যে সব চরিত্র দেখি তাদের যেন ঠিক চিনতে পারি না। অনেক সময় রক্ত মাংসে গড়া মানুষ বলে তাদের মনে হয় না—তাদের চলা বলা যেন যন্ত্রের মতো। তাই অভিনয়ও হয় মেলোড্রামাটিক। যে কটি আধুনিক আমেরিকান নাটক দেখেছি তার মধ্যে কখনও কখনও

স্পন্দন শুনতে পেলেও গোটা জীবনকে পাই নি। তাই মঞ্চের কলা-কৌশল মনে রাখবার মতো হলেও বর্তমান আমেরিকান নাটকের চরিত্রগুলি হৃদয়ের খুব কাছে আসে না। ছেলেবেলা থেকে শুনি ফরাসীরা ভাবপ্রবণ, তাদের উচ্ছ্বাস বেশি, গতি-চঞ্চল জীবনকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিশেষভাবে লেখা সাধারণ নাটকেও যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। তাই মঞ্চের কলা-কৌশল সাধারণ হলেও ফরাসী নাটক মনের গভীরে ফুল ফোটায়।

ইংরেজী ফরাসী কিংবা আমেরিকান নাটকে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সমান অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাদের মধ্যে ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, ময়রা লিস্টার, উইণ্ডি হিলার, বেটি অ্যান ডেভিস, ভিভিয়েন লি এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, মাইকেল রেডগ্রেভ, হার্বার্ট মারশ্যাল অন্যতম।

ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, স্যার লরেন্স ও মাইকেল রেডগ্রেভ—এদের জন্যে আধুনিক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু অভিনয় নয়, জনসাধারণের সুপ্ত সুরুচিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে তারা নানাভাবে চেষ্টা করে এবং একথা বারবার সংরক্ষণশীল ইংরেজকে বোঝায় যে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত না হলে আজ শুধু পিছিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সিবিল থর্নডাইক, তার অভিনেত্রী আত্মীয়া এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যালের আশ্চর্য উদ্যম মনে রাখবার মতো। হবোর্নে কনওয়ে হলে এ সভার আয়োজন করেছিলো ইণ্ডিয়া লীগ। সিবিল থর্নডাইক, এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যাল রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনেক আবৃত্তি করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলো এবং তাঁদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিলো অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ হয়তো সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে।

* * * রাজার দেশের ঝি * * *

সেই ঘটনা থেকেই আরম্ভ করা যাক। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক নাম করা হোটেলে কোনো ধনী ভারতীয় উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর নিজের দম্ভ, মানে দেশে কর্মচারী আর ঝি চাকর মোসায়েবের ওপর হুমকি দাপট ফরমায়েশের কথা সেই ভদ্রলোকের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। এবং বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেলে বসে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন।

একদিন সকাল বেলা যথারীতি দরজায় টুক টুক শব্দ করে হোটেলের মেইড ঘর পরিষ্কার করতে এলো। তাকে গুড মর্নিং জানানো দূরের কথা, শুধু একবার মেয়েটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আনা সিল্কের দামী স্লিপিংস্যুট পরে ভদ্রলোক সিগারেট টানতে টানতে 'টাইম্‌স্' পত্রিকা পড়তে লাগলেন।

মেইড দু এক মিনিট তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়ার থেকে একটা পায়রার পালক বের করে ভদ্রলোক আবার নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে কুকুর ডাকার মতো করে সিস্ দিয়ে মেইডকে ডাকলেন, এই শোনো শোনো—

হাঁ করে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে মেইড বললো, ইয়েস্? তখন ভদ্রলোক সেই পায়রার পালক তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, এটা দিয়ে আমার কান দুটো এই এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ খুঁচিয়ে দাও দেখি—

ইংল্যাণ্ডের ঝি তার চৌদ্দ পুরুষের ইতিহাসে বোধ হয় এমন ব্যাপার কল্পনা করতে পারে নি। আর মনে মনে নিশ্চয়ই সে ভারতীয়দের মুণ্ডুপাত করেছিলো।

কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করে পালকটি ফিরিয়ে দিয়ে বিনীত ভাবে বললো, আমাকে মাপ কর, এসব কাজ করার অভ্যাস আমাদের নেই—

কি! বাধা দিয়ে ভদ্রলোক প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, একটা ঝিয়ের এত বড় স্পর্ধা! আমার হুকুম তুমি মানবে না?

কিন্তু ঝি আর তখন সেখানে নেই। ঘাবড়ে গিয়ে সরে পড়েছে। ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছিলেন কি করে বেটিকে বোঝানো যায় যে তিনি কে! তিনি ঠিক করলেন আর দেরি নয়, ম্যানেজারকে ব্যাপারটা জানিয়ে তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

আবার দরজায় টুক টুক শব্দ। এবার মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ নিয়ে ভদ্রলোক গট গট করে উঠে দরজা খুলে দেখলেন স্বয়ং হোটেলের ম্যানেজার তার সামনে দাঁড়িয়ে।

জানো, ভদ্রলোক রীতিমত গলা ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, তোমাদের এক অসভ্য ঝি আমাকে অপমান করেছে—

বাধা দিয়ে ম্যানেজার আস্তে আস্তে বললো, আমি সমস্ত শুনেছি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নিয়ম-কানুন একটু আলাদা, তাই এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে এই হোটেল ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? চালাকি পেয়েছো? আমাকে কি অমনি থাকতে দিয়েছো? ম্যানেজার আর একবার বললো, তোমাকে যা বলবার বলে দিয়েছি। আমার হোটেলের লোকেরা যদি স্ট্রাইক করে তাহলে সব দিক দিয়ে মুশকিল হবে— তোমার আর কোনো কাজ এ হোটেলের কোনো চাকর-বাকর করবে না: আর তুমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না যাও তাহলে আমি হাই-কমিসনারের অফিসে ব্যাপারটা জানিয়ে তাদের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

ঘটনাটা এখানেই শেষ করা যাক। লঘু পাপে গুরু দণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর ভদ্রলোকের কি হলো, তিনি সত্যি এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেল ছেড়েছিলেন কিনা সে কথায় আমাদের আর দরকার নেই। এতো কথা বলবার উদ্দেশ্য হলো. ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকররা আমাদের চোখে ছোটো তুচ্ছ

কাজ করলেও সব সময় যে তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখবার সুযোগ পায়, তারই সামান্য বর্ণনা দেয়া।

শুধু ভারতীয় ভদ্রলোকের কথা নয়। যে কেউ যদি ঝি-চাকরের ওপর মেজাজ দেখায় তাহলে হয় তাকে ক্ষমা চাইতে হয়, নয় ঝি হারাতে হয়। কিন্তু এমন ঘটনা অবশ্য বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে বিরল। কারণ, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঝি রাখার প্রশ্নই ওঠে না। যাদের বড়ো সংসার তাদের ঘর মোছা বাসন মাজা ইত্যাদি কাজের জন্য ঘণ্টা হিসাবে ঝি রাখতে হয়। ঘণ্টায় প্রায় এক টাকা বারো আনা দেয়ার রীতি। রোজ এতো খরচ করা সম্ভব নয়। তাই অনেকে—যাদের বাড়িতে না রাখলেই নয় অথচ খরচে কুলোয় না তারা সপ্তাহে মাত্র একদিন ঘর বাথরুম ইত্যাদি পরিষ্কার করবার জন্য ঝিয়ের খরচ যোগায়।

অন্য কিছু বলবার আগে সে-দেশের ঝিয়েদের একটু গুণগান করে নেয়া যাক। ভারতীয় ভদ্রলোকের উগ্র স্বভাবের কথা প্রথমেই বলেছি। সেটা হয়তো আমাদের দেশের জল হাওয়ার দোষ। এখানে চাকর-বাকরদের সঙ্গে তম্বি না করলে কাজ করানো কঠিন। একই কাজের কথা অনেকবার বলতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একথার প্রমাণ আমরা বার বার পেয়ে থাকি। ও দেশেও এমন হবে—এমনি একটা ধারণা আমাদের মনে থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রথম প্রথম ও দেশে গিয়ে আমরা যখন ঝি চাকরকে ফরমায়েশ করবার সুযোগ পাই তখন সাধারণত ধরে নি যে ওরাও ফাঁকি দেবে, ঠিক মতো কাজ করবে না, এক কাজের জন্যে বার বার কৈফিয়ত চাইতে হবে।

কিন্তু ভুল ভাঙে সহজেই। সত্যি, ইংল্যাণ্ডের ঝিয়ের কাজের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। কোথাও ফাঁকি দেবার লেশমাত্র চেষ্টা নেই। এক কাজ দুবার করতে বলবার কথাই ওঠে না। ঘরে টাকা পয়সা দামী জিনিসপত্র ছড়িয়ে বেরিয়ে যান, ফিরে এসে দেখবেন ঝকঝকে তকতকে ঘর, একটি জিনিসও হারায় নি, টাকা পয়সা যেমনকার তেমনি আছে, ঝি সব সুন্দর সাজিয়ে রেখে ঘর পরিষ্কার করে গেছে। আর কোনো সংসারে যখন ঝি

কাজ করতে আসে তখন তার খাতিরের বহর দেখে ঘাবড়ে যেতে হয়। হ্যালো মিস অমুক কি মিসেস তমুক, গুড মর্নিং! কেমন আছো? এ্যা একটু রোগা হয়ে গেছ যেন। 'ফ্লু,' হয়েছিলো নাকি! এসো আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাও।

তখন হয় তো ব্রেকফাস্টের সময়। ঝিও বসে গোল টেবিলে। বলা বাহুল্য চা ছাড়া অন্য কিছু সে খাবে না, কেউ খেতে বলবেও না। কারণ তাকে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি, আর সে জানে যে সে অন্য কিছু খেলে এদের কম পড়ে যাবে। কিন্তু সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে ঝি যখন চা খায় তখন কে বলবে সে ঝি, ঘণ্টায় এক টাকা বারো আনা নিয়ে দু ঘণ্টার জন্যে কাজ করতে এসেছে। তার মনুষ্যত্ব, তার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণ সব সময় সতর্ক এবং সচেষ্ট।

কিন্তু আগে যা বলছিলাম। ও দেশের ঝি-চাকরের ওপর মেজাজ খারাপ করার প্রশ্নই ওঠে না। আর যেহেতু স্বাধীন দেশ তাই তাদের মনুষ্যত্বের মূল্যও কড়ায়গণ্ডায় (শিলিং-পেন্সে বলাই ভালো) চুকিয়ে দেয়া হয়। এতো বেশি দেয়া হয় যে আমাদের চোখে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় যেন।

যেটুকু বললাম সেইটুকুই বোধ হয় যথেষ্ট। এখন দূর থেকে পাঠক-সাধারণ হয়তো মনে করবেন, কী সুখেই আছে ওখানকার ঝি-চাকর। ঘণ্টায় এক টাকা বার আনা—হোটেলে কিংবা রেস্তোরাঁয় কাজ করলে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড থেকে পাঁচ পাউণ্ড যে দেশে ঝি-চাকরের উপার্জন, সে-দেশে ঘর ঝাঁট দিয়েও লাভ। তাছাড়া কথায় কথায় টিপ্‌স্ মানে বকশিশের ব্যাপার তো আছেই। ছোটো কাজ করলেও যে দেশে সমাজের চোখে আমি ছোটো নই আর আমার সামাজিক মর্যাদা অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে কম নয় তাহলে বলা বাহুল্য কোনো কিছু নিয়ে সহসা আমার আপত্তি তোলার কথাই উঠতে পারে না।

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। মুখ মিষ্টি আর সৌজন্যের বড়াই বোধ হয় ধনী ইংরেজের মত আর কোনো জাত করতে পারে না। বস্তুত, কারুর কাছ থেকে মধুর ব্যবহার পেলে তার জন্যে আমরা নিজের অজ্ঞাতে চরম ক্ষতি হয়তো

স্বীকার করে নিতে পারি। এমন কি, অমায়িক ব্যবহারের বাড়াবাড়িতে আর মনুষ্যত্বকে সম্মান করবার অলীক অভিনয়ে মানুষের পক্ষে এতো বেশি বিভোর হয়ে থাকা স্বাভাবিক যে সে তার জন্মগত দাবির কথাও ভুলে থাকতে পারে।

বিদেশীর কাছে ঝি-চাকরের ওপর ইংরেজের ব্যবহার বিস্ময়ের কথা বৈকি! সত্যি কথা বলতে গেলে জীবনে তাদের চাইবার আর কি থাকতে পারে! আমাদের দেশের তুলনায় তাদের আয় প্রচুর, যে কোনো হোটেলে যে কোনো লোকের পাশে বসে তারা খুশি মতো খেতে পারে। সর্বত্র তাদের অবারিত দ্বার। ঝি-চাকর বলে কেউ তাদের এতোটুকু অবহেলা করবে না।

বিদেশী এই দেখেই তাজ্জব বনে যায়। শুধু বিদেশী কেন, ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকররা তাদের পাওনা নিয়ে কখনও প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এমন কি, মনে হয়, তারা নিজেদের অবস্থায় খুশী আছে।

কিন্তু মধুর ব্যবহারে মন খুশী থাকলেও পেট ভরে না। মন খুশী আছে বলে এরা তেমন করে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু হয় তো নিজেদের অজ্ঞাতে ধাপে ধাপে অন্য দিক দিয়ে অনেকখানি নেমে যায়।

এবার সে কথা আরম্ভ করি। সত্যিই তো, আমাদের দিক থেকেও কোনো আপত্তি উঠতে পারে না। একজন ঝি যদি মাসে দুশো ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে পায় তাহলে বলবার আর কি থাকতে পারে। সে তো আমাদের দেশের খরচের তুলনায় রীতিমতো বড়লোক।

কিন্তু দেশের নাম ভারতবর্ষ নয় ইংল্যাণ্ড। আর একথা আমাদের অজানা নেই যে আমাদের দেশের তুলনায় সে-দেশের আয় অনেক বেশি হলেও ব্যয়ের মাত্রাও বেশি। কাজেই আমাদের দেশের ঝিয়ের কাছে ঘণ্টায় এক টাকা বারো আনা কিংবা মাসে দুশো ষাট টাকা প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো সংখ্যা হলেও সে-দেশের খরচের মানদণ্ডে সে-সংখ্যা ততখানি নয়।

আরও একটি কথা। এদেশের ঝিয়েদের জাত আলাদা। তারা আধপেটা খেয়েও দিন কাটায়, মাদুর বিছিয়ে শোয়, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে। এতে তারা অভ্যস্ত। তারা এতোদিন জানতো এই তাদের পাওনা,

এমনি করেই তাদের জীবনের শেষ দিন অবধি কাটাতে হবে। তারা গরিবের পর্যায়ে পড়ে, এতোদিন সমাজ তাদের কোনো স্বীকৃতি দেয় নি। ছোটলোক বলে এক কোণায় ঠেলে রেখেছিলো। আজ যবে দেশের হাওয়া বদলেছে, তারাও বুঝেছে মানুষের মতো বেঁচে থাকবার তাদেরও পূর্ণ অধিকার আছে; আর খুব আস্তে আস্তে হলেও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তারা সচেতন হচ্ছে। এমন কি মাঝে মাঝে তাদের সবল প্রতিবাদে অনেক গৃহস্থের পিলে চমকে উঠছে।

কিন্তু ভেবে দেখুন বাড়ির ঝি-চাকরের সবল প্রতিবাদ কতো সহজ উপায়ে বন্ধ করা যায়! আর মনে হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো তাদের আর্থিক অনটনের কথা তুলে কোনোদিনও তারা মাইনে বাড়াতে বলে আপনাকে আর বিব্রত করবে না। অন্য যে কোনো উপায়ে তারা তাদের অভাব পূর্ণ করে নিতেও দ্বিধা করবে না।

অর্থাৎ, আপনি যদি তাদের সঙ্গে ধনী ইংরেজের মতো ব্যবহার করেন। হেসে কথা বলেন—আপনার সঙ্গে চা খেতে বলেন; মানে তানানা এটা ওটা করে কোনো রকমে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনি আর সে দুজনেই মানুষ এবং পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের দাবি দুজনেরই সমান। ব্যাস্ বাজি মাৎ। অথচ অন্যদিকে আপনি কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। নিজে ঝিয়ের সঙ্গে প্রেম করবার কথা ভাবতেও পারবেন না, ছেলে ঝি কিংবা তার মেয়েকে বিয়ে করলে মারমুখো হবেন। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কোনো বোকা মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলবেন, ওর বিদ্যে-বুদ্ধি একটা ওয়েট্রেসের মতো। অথচ আশ্চর্য তবু ঝি-চাকররা বুঝতে পারে না, তারা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ কী ভাবে ঠকে আসছে!

ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকরের সঙ্গে সে-দেশের লোকের ব্যবহার দেখে প্রথমে আমি শুধু বিস্মিত হই নি—দেশবাসীকে মনে মনে অজস্র প্রশংসা করেছিলাম এবং বলতে সংকোচ নেই, মানুষকে আরও বেশি করে সম্মান করতে শিখেছিলাম।

কিন্তু আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে যখন বিস্ময়ের পর্দা সরে গেলো

এবং ইংল্যাণ্ডের হালচাল বুঝে সেখানকার ঝি-চাকরদের অবস্থার আসল রূপ যখন দেখতে শিখলাম তখন মনে হলো বঞ্চিতকে সুকৌশলে আত্মবিস্মৃত করে রাখা হয়েছে।

প্রথম কথা, খরচ সেখানে উপার্জনের তুলনায় বেশি। দ্বিতীয়ত, ঝি-চাকররা রীতিমতো সম্মান পায় এবং বলা বাহুল্য এ ফাঁকা সম্মান মারাত্মক, কারণ তা তাদের আয় বাড়ায় না কিন্তু ব্যয় বাড়ায়। যেমন তাকে অন্য আর একজন মধ্যবিত্তের মতো বাঁচতে হয়, তাদের মতো ব্যালে অপেরা দেখবার সাধ জাগে আর ভদ্র সমাজে যার সমান সম্মান তার জামা-কাপড়ও ভালো হওয়া দরকার। ফল হয় এই যে, তার চাল চলন হয় মধ্যবিত্তের মতো এবং ঠাট বজায় রাখতে ঘটের দরে মনসা বিকিয়ে যায়। তবু সে খুশী কারণ সম্মান তো পাচ্ছে! অর্থাৎ উপায় নেই, কারণ তার মন বেশ কায়দা করেই মাতিয়ে রাখা হয়েছে। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সহজে সে ব্যগ্র হতে পারবে না।

অথচ লোভ তার দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। সে আরও ভালো খেতে চায়, আরও ভালো পরতে চায়, আরও ঘন ঘন সিনেমা-থিয়েটারে যেতে চায়।

কিন্তু সব সাধ তার পক্ষে একা মেটানো সম্ভব নয়, তাই তাকে নির্ভর করতে হয় বন্ধু-বান্ধবের ওপর। সেদিকেও হয় মুশকিল কারণ একজন ঝিয়ের বন্ধুর আয় প্রায় তারই মতো। ফলে মধ্যবিত্ত অভ্যাসের জন্য তাকেও হিমসিম খেতে হয় এবং এক বন্ধুকে নিয়ে ঝিও সন্তুষ্ট থাকে না। তার পাঁচ বন্ধুর দরকার হয়।

এমনি করেই মন পুড়ে যায়, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হয় এবং সংসারে অশান্তি আসে। তাই দেখা যায় অর্থের জন্যে ইংল্যাণ্ডের এই সমাজে পারিবারিক অশান্তি প্রবল এবং কথায় কথায় সংসার ভেঙে যায়। আর ইংরেজ মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমাদের সমাজে ডির্ভোস ছোটলোকদের মধ্যেই বেশি হয়।

ওপর ওপর ঝি-চাকরদের যথেষ্ট খাতির করা হলেও ইংল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে বুঝতে পেরেছি মনে মনে প্রভেদের বিরাট প্রাচীর তোলা রয়েছে। বিয়ে-বন্ধুত্বের ব্যাপারে এই শ্রেণীর লোকদের ওপরতলার লোকেরা

সযত্নে এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ একেবারে পরিষ্কার ভাবে না বললেও সুবিধাবাদীর সমাজ কৌশলে বুঝিয়ে দেয় যে কার কোথায় স্থান।

তবু আশার কথা আজ আস্তে আস্তে একটা আলোর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৃথিবীর হাওয়া বর্তমানে এমনি যে শুধু ধাপ্পা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেয়া অত্যন্ত কঠিন।

প্রথম কথা জীবনে আরও বেশি আনন্দ পাবার জন্যে বন্ধু বাছাই করবার সময় ইংল্যাণ্ডের এই সমাজ খুব একটা বাছবিচার করবার অবসর পায় না। বরং যে ঝিয়ের জন্য বেশি ব্যয় করতে পারে সে নির্বিচারে তাকেই বন্ধুত্বে বরণ করে নেয়।

বলা বাহুল্য ওই সমাজের একজন লোকের চেয়ে প্রবাসী ভারতীয়র ব্যয় করবার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং রাজার দেশের ঝিয়ের জন্যে সে তাই করেও থাকে।

বিলিতি ঝিয়ের সঙ্গে ভারতীয় ভদ্র সন্তানের মাখামাখির কথা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি। কিন্তু অন্য আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখলে এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরে এবং দুইজনেরই মনের পরিবর্তন তাদের ঘুন ধরা সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়।

শিক্ষিত ইংরেজের সঙ্গ পাওয়া ইংরেজ ঝির পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অন্য দেশের লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মন জানাজানির সুযোগ প্রায়ই হয়। কারণ বিশেস করে নিগ্রো ও ভারতীয়—যত বড় ঘরের ছেলে হোক না কেন, বিলেতে তাদের কালো রঙের জন্য সেখানকার সমাজে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় এবং নানা অপমানও সহ্য করে। কিন্তু তাদের অর্থের প্রাচুর্যের জন্যে তারা দরিদ্রের সংসারে সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

বিলিতি তথাকথিত উচ্চসমাজে বর্ণের জন্যে আঘাত পাবার পর ধনী বিদেশীর চোখে তার নিজের সমাজেরই একটা স্বার্থপরতার রূপ প্রকট হয়ে ওঠে এবং সে অন্য জায়গায় সমবেদনার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর এক সময় ঝিয়ের দেখা মেলে। কেননা অন্য কেউ তার রঙের

গর্বের জন্যে বিদেশীর সঙ্গে মনের আদান-প্রদানের পথ সহজে সুগম করবে না। কিন্তু এই দেখা হবার ফলে লাভ হয় দুই পক্ষের। এতোদিন পর বিলিতি ঝি সত্য শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে পৃথিবীর অনেক তথ্য জানতে পারে এবং বিদেশীটি গভীর সমবেদনায় সেই ঝির দুঃখ-বেদনার আশা-আনন্দের ভাগ নেবার চেষ্টা করে। আর সমাজের এই লাভ হয় যে অজস্র বঞ্চনার মাঝখানেও আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক একতা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

লণ্ডনে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কয়েকটি দিন

সেদিনও অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ লণ্ডনে পৌছলেন না। ১৯৪৮ সালের মহাষ্টমী। ঠিক ছিলো, এ বছর বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর বিজয়া উৎসবে অধ্যাপক মহলানবীশ হবেন প্রধান অতিথি। যদি তিনি যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে ভারতের হাই-কমিসনার কৃষ্ণ মেননকে তাঁর আসনে বসাবার আয়োজন করা হবে কি না, সে সম্বন্ধে আজ ইণ্ডিয়া লীগে আলোচনা হবার কথা। কৃষ্ণ মেনন বাংলা জানেন না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ বাংলা সমিতির অসংখ্য অবাঙালী সভ্য বলে প্রধান অতিথির অভিভাষণ সাধারণত ইংরেজীতেই হয়ে থাকে।

স্ট্র্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া লীগ অফিসে পৌছতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেলো। এই অক্টোবরে ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে—কুয়াশাও হয়েছে গভীর। হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে চলতে লোকের ঘাড়ে পড়ে কতবার যে 'সরি' বলতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। ইণ্ডিয়া লীগের জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেলুম, বিজয়া উৎসবের মহড়া এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—

> "যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল
> ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত ঢেউ ওঠে উত্তাল
> হয়ো নাকো শংকিত তালে তার দিও তাল
> জয় জয় জয় গান গাইও——"

এ সময় ঘরের দরজা খুলে তাল কেটে দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই পাশের নির্জন অফিস ঘরে গিয়ে আলো জাললুম। আর সঙ্গে সগে কে যেন বলে উঠলো, অন্ধকারে গান শুনতে ভালো লাগে না?

আমাদের প্রোগ্রাম তো এইমাত্র শেষ হলো, এবার বলুন আপনার কি প্রোগ্রাম ?

এই সবাই মিলে একটু এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে চাই, কারণ—

বলুন বলুন।

না থাক—

আরে কি আশ্চর্য, মিঃ বড়ুয়া আপনি যেন লজ্জা পাচ্ছেন মনে হচ্ছে—

সলজ্জ হাসি হেসে এবার তিনি বলে ফেললেন, আজ আমার জন্মদিন।

বলেন কি ? এই কথাটা বলতে আপনি সঙ্কোচ করছিলেন, অনেকে এক সঙ্গে বলে উঠলো, চলুন আমরাই আজ খাওয়াবো আপনাকে, আসুন যমুনা দেবী—প্রচণ্ড হট্টগোল করতে করতে আমরা ইণ্ডিয়া লীগ থেকে বেরোলাম।

সেই শীতের রাত্তিরে কুয়াশা থমথম করা রাস্তায় একদল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সারা ভারতের অতিপ্রিয় নট প্রমথেশ বড়ুয়াকে দেখলে কারুরই মনে হতো না যে, তিনি ছাত্রদের একজন নন।

মিঃ বড়ুয়া জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন ?

আপনার কি খেতে ইচ্ছে করছে ? দিশি না বিলিতি ?

না না বিলিতি নয়, দিশি অনেক ভালো।

যমুনা দেবী হাসলেন, ডাক্তার যা করতে বারণ করেন, উনি তাই করেন, ঝালঝোল খাওয়া ওঁর উচিত নয়—

বাধা দিয়ে বড়ুয়া উদাসভাবে শুধু বললেন, উচিত ? এই কুয়াশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপা কি উচিত—আজ যে আমার জন্মদিন—

আমরা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম, Many happy returns.

গোটা তিন চার ট্যাক্সি ভাড়া করে স্ট্র্যাণ্ড থেকে কেম্ব্রিজ সার্কাসের 'রাজা' রেস্টুরেন্টে পৌঁছতে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগলো। দুটো বড়ো বড়ো টেবিল জোড়া দিয়ে আমরা এক সঙ্গে বসলাম—মাঝখানে পাশাপাশি বড়ুয়া ও যমুনা দেবী।

মিঃ বড়ুয়া বললেন, বাঃ দিশি খাবারের গন্ধ বেশ লাগছে তো—

বললাম, এদেশে আমাদের সাহেব সাজতে বড়ো ভালো লাগে, কিন্তু খাবার ব্যাপারে সাহেব সাজা বড়ো কঠিন।

ঠিক ঠিক, একটু উসখুস করে তিনি বললেন, কই, খাবার আনতে ওরা বড়ো দেরি করছে যে—

যমুনা দেবী হেসে বললেন, তুমি কতো খাবে আমরা জানি।

সত্যি, তিনি খুবই কম খেলেন! বলতে গেলে কিছুই খেলেন না।

যমুনা দেবী জানালেন, বাড়িতেও তিনি নাকি অমনি পাখির মতো আহার করেন, ভোজনে তাঁর রুচি একেবারেই নেই।

কিছু বলুন মিঃ বড়ুয়া?

কি বলবো?

জন্মদিনের বাণী?

নির্ভয়ে বলবো?

নিশ্চয়ই!

এবার তিনি প্রত্যেকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, বাংলা সাহিত্যে কিছু হচ্ছে না—একেবারে রাবিশ—

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আর বাংলা ছবি?

খুব জোরে হেসে তিনি বললেন, বোকা বনে গেলেন তো—সাহিত্য যদি রাবিশ হয়, তাহলে ছবি তো মানে—বুঝলেন? তাই ছবি খারাপ হলে সব সময় সাহিত্যিককে দায়ী করবেন—ডাইরেক্টারকে নয়।

কিন্তু ভালো লেখকের ভালো বই যখন—

যমুনা দেবী বাধা দিয়ে বললেন, আহা, আজ ওঁর জন্মদিন।

তাই ভাবছি একটা কবিতা লিখবো।

সে কি মিঃ বড়ুয়া, আপনি কবিতা লেখেন নাকি?

হঠাৎ উদাস হবার ভান করে তিনি বললেন, ওটাই জীবনে বাকী আছে—তাই আজ লিখবো ভাবছি।

সবাই বলে উঠলো, কি লিখবেন, বলুন না শুনি?

বলবো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ভয়ে না নির্ভয়ে ?

নির্ভয়ে।

রিয়েলি ? কিন্তু একটা বিপদের কথা আছে যে—মানে আমাদের মধ্যে এখানে দু একজন কবি-টবি আছেন কিনা—

কেউ নেই মিঃ বড়ুয়া, আমি আরও পাঁচ-ছ চামচ পোলাউ প্লেটে তুলে নিয়ে বললাম, এখানে সব গল্প লেখক।

চলুন, সকলে একদিন পিকনিক করতে যাই—

আগে কবিতা বলুন।

মিঃ বড়ুয়া আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কবির অভিনয় করে বললেন, হোটেলে কবিতা হয় না, যেদিন পিকনিক করতে যাবো, সেদিন হবে—গাছের ছায়ায় খোলা আকাশের নিচে—বলুন কবে পিকনিকে যাওয়া হবে ?

সেই রাত্তিরেই পিকনিকে যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ঠিক দিনেই লণ্ডনে এসে পড়লেন। কাজেই প্রধান অতিথির ভাবনা আর কাউকেই ভাবতে হলো না। মনের মতো লোককে পেয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হলাম।

হর্বোন হলে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে। গল্প, কবিতা, গান একের পর এক শোনা যেতে লাগলো। একেবারে সামনে বসে আছেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁকে আজ বড়ো ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে, আর তাই মনে হচ্ছে তিনি যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। শুধু ভারতীয়দের নয়, অনেক ইউরোপীয় অতিথির কৌতূহলী চোখ তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মহলানবীশের সারগর্ভ বক্তৃতার পর

যখন শেষ কোরাস গাওয়া হবে, তখন কোলাহল জাগলো, অর্থাৎ সকলে মিঃ বড়ুয়ার কথা শুনতে চান। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। জেদী ছাত্রদের ঠেকাবে কে? তাই অবশেষে মিঃ বড়ুয়াকে উঠতেই হলো। তিনি মুখে সেই হাসি নিয়ে একেবারে স্টেজের সামনে এগিয়ে এলেন। তারপর অনেক বিদেশীর ভিড় হয়েছে বলে অন্যান্য বক্তাদের মতো ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন, আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহলানবীশের সামনে কিছু বলতে হবে ভেবে আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছি, আর আপনাদের সকলকে সামনে দেখে কেমন করে আরম্ভ করবো, তাও ভেবে পাচ্ছি না। কথা তৈরি করা তো আমার কাজ নয়—আমার যা কাজ তাতে এতো লোকও সামনে থাকে না। আশা করি, প্রথমেই আপনারা আমার এই মুহূর্তের অসহায় অবস্থার কথা দয়া করে বুঝে নেবেন। আজ বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর এই বিজয়া উৎসবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি বলে নিজেকে সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে করছি। সাত হাজার মাইল দূরে আমাদের জাতীয় উৎসব এমন করে যাঁরা সার্থক করে তুললেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু আপনাদের কাছে একথা বলতে পেরে ভালো লাগছে যে, ছাত্রদের সঙ্গে থাকলে আমি যেন নতুন শক্তি পাই, কারণ আপনারা সব সময় আমাকে যৌবনের গান শোনান—

কয়েকদিন পর এক হালকা রোদ্দুর ওঠা সকালবেলা ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড (মিঃ বড়ুয়ার বাড়ি) থেকে আমরা হ্যাম্পস্টেড হীথে পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়লাম। খাবার-দাবার যে যার সঙ্গে নিয়েছিলো, তা ছাড়া যমুনা দেবীও অনেক আয়োজন করেছিলেন।

ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড থেকে হ্যাম্পস্টেড হীথ বেশী দূরে নয়, আমাদের পৌঁছতে দেরি হলো না। পিকনিক করবার জায়গা বটে—সুদূর বিস্তৃত মাঠ, এপাশে ওপাশে অসংখ্য গাছের সারি, কতো রকম ঢিবি আর মাঝে মাঝে

পুকুর। এই হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতরেই কয়েকটা বাড়ি আছে—রাত্তিরে তার আলো লাইট হাউসের মতো জলে। দোকান-বাজার বেশ দূরে বলে যারা হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতর বাস করে, তাদের সব সময় কেনাকাটার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়।

প্রথমে খেলা আরম্ভ হলো। গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরি হলো ব্যাট আর রবারের একটা বল আমরা সঙ্গে করে এনেছিলাম। বড়ুয়া সাহেব ভাঙা ডালের ব্যাট নিয়ে কেবলই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। খেলতে গেলে যে একটা বলের দরাকর, সেকথা তাঁর খেয়াল নেই।

যমুনা দেবী থেকে থেকে হাঁ হাঁ করে উঠছেন, আঃ তুমি অতো লাফালাফি করো না—শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মিঃ বড়ুয়া আপনার যে আজ কবিতা লেখার কথা—

My goodness, আমার এখন মুড্ নেই—

ছাত্রদের সব ব্যাপারেই মিঃ বড়ুয়ার উৎসাহ ছিলো সবচেয়ে বেশী। এমনভাবে কতোবার তিনি আমাদের সঙ্গে হৈ হৈ করেছেন। তার ঠিক নেই। নিজে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে লণ্ডনের সেই প্রচণ্ড শীতেও তিনি যেন আমাদের মাতিয়ে রাখতেন।

শুধু তাঁর উৎসাহ ছিলো না মাত্র একটি ব্যাপারে। নিয়ম করে রোজ রোজ কিছুতেই তিনি ডাক্তারের বাড়ি যেতে চাইতেন না! ও ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিলো যমুনা দেবীর। আমাদের সামনেই কথা হতো।

কাল তাহলে, মিঃ বড়ুয়া বললেন, স্কেটিং দেখতে যাওয়া যাক—

যমুনা দেবী বাধা দিলেন, না ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

সে তো আজ গেলাম।

কালও যেতে হবে।

ও বাবা, সে হয় না।

খুব হয়।

কিন্তু আমি তো বেশ ভালো আছি।

তবু তোমাকে রোজ এখন নিয়ম করে ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে।

নিয়ম কি আমি মানি ?

যমুনা দেবী কথা না বলে মুচকি হাসলেন। কথা তিনি খুবই কম বলতেন।

আমি হেসে বললাম, যমুনা দেবী আপনার খুব মুশকিল হয়েছে বলুন ?

না না, মুশকিল আর কি—

মিঃ বড়ুয়া কথা শেষ করে দিলেন, ওঁর বড়ো ভাবনা হয়।

যমুনা দেবী স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তা হয়।

ডাক্তার কি বলেন ?

চিকিৎসা তো চলেছে।

কিছুদিন হাসপাতালে থাকলে ভালো হয় না ?

শিউরে উঠে মিঃ বড়ুয়া বললেন, অসম্ভব, আমি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে পারবো না—গেলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবো—

শুনলেন তো ? উনি ওই রকম।

সে-বছর নয়। গত বছর মিঃ বড়ুয়া আবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। যমুনা দেবী সঙ্গে ছিলেন না এবার। মিঃ বড়ুয়া তার দিদি শ্রীমতী নীলিমা দেবীর সঙ্গে থাকতেন।

হঠাৎ একদিন ইণ্ডিয়া হাউসে সাড়া জাগলো শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সত্যি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। সে-দেশের লোক রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো। বিনা খরচে প্রচুর আরামে থাকা যায় বলে রোগ সেরে গেলেও হাসপাতাল থেকে ইংল্যাণ্ডের লোক সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না। তারা বলাবলি করলো, ইণ্ডিয়ান প্রিন্সের কাণ্ডই আলাদা, ওদের মেজাজ বোঝা সহজ নয়, বুঝলে হে নার্স ?

নার্স মাথা নেড়ে জানালো, বুঝেছে।

মিঃ বড়ুয়াকে কোথাও পাওয়া গেল না। নীলিমা দেবী আর তাঁর ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছাত্র মহলে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো।

সন্ধ্যেবেলা বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। তিনি নাকি ব্রাইটনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তার হঠাৎ সমুদ্রের হাওয়া খাবার সাধ হয়েছিলো।

যমুনা দেবী নেই বলেই আপনি এতো বাড়াবাড়ি করছেন ?

বাড়াবাড়ি ? যাঃ—

চলুন আবার হাসপাতালে—

শান্ত ছেলের মতো তিনি বললেন, চলুন।

তাকে দেখলেই আমাদের যমুনা দেবীর কথা মনে পড়তো।

লণ্ডনে দিনকয়েকের আলাপে আমরা মিঃ বড়ুয়াকে যত ভালোবেসেছি ঠিক ততো শ্রদ্ধা করেছি যমুনা দেবীকে। মিঃ বড়ুয়ার অসুখ অনেকদিনের— শুনেছি এক মুহূর্তের জন্যেও যমুনা দেবীর সেবায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। তার মঙ্গলকামনায় তিনি সব কিছুই তুচ্ছ করেছেন। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি তার ভালবাসায় এতোটুকুও ফাঁকি ছিলো না। কথা তিনি বেশী বলতেন না কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার আরোগ্যের জন্যে তার চোখে মুখে ফুটে উঠতো নীরব ব্যাকুলতা ! স্বামীর সুখ-দুঃখ যার কাছে সমান, যে শুধু আনন্দ দিনের সঙ্গিনী নয়, স্বামীর কল্যাণ কামনায় যার চোখে রাত্রিদিন জ্বলে মঙ্গলের আলো—তাকে বাংলাদেশ চিরকাল কি চোখে দেখে এসেছে ?

সেকথা আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

✽ ✽ ইংরেজ লেখকের ঘরের খবর ✽ ✽

আমরা অবাক হয়ে বলবো, কী আশ্চর্য! আর যাদের কল্পনাশক্তি প্রবল তারা গালে হাত দিয়ে ভাববেন, হায়. লেখার রোগই যখন ধরলো তখন একজন ইংরেজ লেখক হয়ে জন্মাতে পারলাম না কেন!

যেদেশে একটি কবিতা লিখে দশ পাউণ্ড—প্রায় একশো চল্লিশ টাকা—একটি ছোট গল্প লিখে পঁচিশ পাউণ্ড—মানে প্রায় তিনশো চল্লিশ টাকা আর একটি গোটা উপন্যাস লিখে কম করে দুশো পাউণ্ড পাওয়া যায়—সে-দেশের কথা শুনে আমাদের দেশের দারিদ্র্য-দীর্ণ লেখকদের বিলক্ষণ ব্যাকুল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক বৈকি!

আমি সাধারণ ইংরেজ লেখকের পারিশ্রমিকের একটা মোটামুটি নমুনা দেবার চেষ্টা করছিলাম। বস্তুতঃ, ছেলেবেলা থেকে নানা লোকের মুখে আর অনেক লেখকের রচনায় ইংরেজ লেখকের সৌভাগ্যের বর্ণনা পেয়েছি। তাই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অন্ততঃ তাহলে পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে লেখকেরা বলতে পারেন, আমি শুধু লিখি—সেখানে সংসারের অনিবার্য দাবির জন্যে লেখকদের মাথার শিরা দপ্‌ দপ্‌ করে না আর আরও নানা কারণে আর্থিক দুশ্চিন্তায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের অকাজ-কুকাজ করতে হয় না—মানে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক হয়ে, শুধু পেটের দায়ে তাদের লেখক ও চিত্রনাট্যকার কিংবা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বলে নিজেদের ঘোষণা করবার প্রয়োজন হয় না।

তাই প্রথমে খুব অবাক হতে হলো যখন দেখলাম অনেক স্বনামখ্যাত লেখক প্রত্যহ কোন সদাগরী আপিসে সাড়ে-নটা—পাঁচটা করেন কিংবা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী হয়ে বসেন আর 'বি-বি-সি'তে প্রযোজকদের আপ্যায়িত করবার জন্যে রীতিমতো ধর্ণা দেন। এর মধ্যে চিত্র-পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তো কথাই নেই—ঠিক আমাদের দেশের লেখকদের

মতোই প্রকাশকদের দুর-ছাই করে হৈ হৈ করে সিনারিও রচনা করেন আর কল্পনা করেন, আমিও একদিন গাড়ি-বাড়ি করবো আর সময়ে-অসময়ে কন্টিনেণ্টে ঘুরে আসবো।

এই সব দেখে শুনে বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে হতাশ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। আমি যথাসময়ে বুঝতে পারলাম ইংরেজ লেখকদের ঘরের অবস্থা আমাদের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। বরং ও দেশের সাধারণ লোকের বসবাসের ধরন-ধারন তুলনা করলে ইংরেজ লেখকদের দরিদ্র না বলে উপায় নেই।

কথা উঠবে, কেন, এ আবার কি? অত টাকা পেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ কি? কারণ আছে বৈকি আর তা এত স্পষ্ট যে না উল্লেখ করলেও চলে। অর্থাৎ ইংরেজের জীবনধারণের রীতিনীতি আমাদের চোখে আশ্চর্য রকম ব্যয়বহুল। তাদের যে-পরিমাণ আয়, ব্যয় তার চেয়ে বেশী তো কম নয়। তাই শুধু লেখার ওপর নির্ভর করা চলে না, কারণ লেখকের মেজাজ অনিশ্চিত—কখন তোড় বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কি। তাছাড়া সাহিত্য-পত্রিকার সংখ্যা লণ্ডনে বর্তমানে খুব বেশী নয় আর নিয়মিত প্রতি মাসে একটি করে ছোট গল্প লিখে তিনশো টাকা পাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ লেখকের সংখ্যাও তো কম নয়—সকলকেই টিকে থাকতে হবে। আর বছরে কটাই বা উপন্যাস লেখা যায়!

বস্তুতঃ, পৃথিবীর সর্বত্র লেখকদের অবস্থা বোধহয় এক। এদেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন খুব বেশী নয়। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট। আমাদের দেশের লেখকসাধারণ সপরিবারে হাওয়া-বদল করতে যাবার কথা না ভেবে কালকে র‍্যাশন কেমন করে যোগাড় হবে সেকথা ভাবেন—প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত আনন্দ-উৎসবে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ধরা-বাঁধা মাইনের একটা নির্দিষ্ট চাকরি তো আছেই। লেখকদের এই নিয়ে অস্বস্তি, অনুযোগ-অভিযোগ আছে কিন্তু উপায় নেই। এই নিয়ম হয়ে গেছে। আর প্রপিতামহের আমল থেকে আমাদের প্রয়োজন সামান্য—আমাদের

জীবনধারণ মানে কোনরকমে টিকে থেকে দিন কাটানো। তাই একটি গল্প লিখে পঁচিশ টাকা মানে দু পাউণ্ডের কম পেয়ে আমরা খুশী হয়ে ভাবি, খুব পেয়েছি। আর ইংরেজ লেখক পঁচিশ পাউণ্ড পেয়েও ভাবে একটা গোটা গল্প লেখার পরিশ্রম করে কিই বা এমন পেলাম! কারণ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন আমাদের চেয়ে অনেক বেশী—তার জীবনধারণের আয়োজন আমাদের কল্পনার বাইরে।

ইংরেজ লেখক যদি অবিবাহিত হয় তাহলে সাধারণতঃ আশ্রয় নেয় কোন প্রাইভেট বোর্ডিং হাউসে—সেখানে তার থাকার খরচ শুধু ব্রেকফাস্ট নিয়ে সপ্তাহে চার-পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ষাট-পয়ষট্টি টাকা। তাছাড়া আরও দুটো খাওয়া, মানে লাঞ্চ আর ডিনার—সে বন্দোবস্ত আলাদা করতে হয়—হয় নিজেই ঘরে তৈরি করে নেয় না হয় বাইরে খায়—খরচ, খুব কম করে সপ্তাহে প্রায় আরও দুতিন পাউণ্ড। অবশ্য একটু উঁচু দরের অবিবাহিত লেখক ঠিক এভাবে বোর্ডিং হাউসে থাকবে না। সে নিজের আলাদা ফ্ল্যাট খুঁজে নেয় এবং লেখকজনোচিত ঠাট-ঠমক যথাসাধ্য বজায় রাখে। মানে মনের মতো করে ঘর সাজায়, ভদ্রগোছের কার্পেট কেনে—অতিথি অভ্যাগতদের নিজের বিশেষ রুচির পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। ফ্ল্যাটের ভাড়া সপ্তাহে একশো-দেড়শো টাকা। তাছাড়া এটা ওটা সংসারের আরও নানা খরচ তো আছেই। তার নিশ্চয়ই বান্ধবী আছে, তাকে নিয়ে নাচে বায়স্কোপে থিয়েটারে যেতে হয়; গ্রীষ্মকালে দেশভ্রমণে না গিয়ে উপায় নেই। আর যারা বিবাহিত, তাদের বান্ধবীর বালাই নেই বটে কিন্তু স্ত্রী তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী অর্থাৎ আনন্দ-উৎসবে, মেলায়, পার্কে, গ্রীষ্ম-উৎসবে, সমুদ্রতীরে তাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। যস্মিন দেশে যদাচার।

এটা ঠিক, দূর থেকে ইংরেজ লেখকের চেহারা দেখলে তার সংসারের অভাব আমাদের চোখে একেবারেই পড়ে না, কারণ তার জামাকাপড় আর ড্রাস-করার দেশোপযোগী কৌশল আমাদের বরং চোখ ধাঁধিয়ে দেয় কিন্তু অভাব লুকিয়ে আছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে।

একজন লোক যার পৃথিবীব্যাপী যশ—হঠাৎ শুনি তিনি নাকি আর একজন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। আপনারা বলবেন, তাতে কি হলো—বন্ধুর সঙ্গে বাস তো অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক বন্ধুর সঙ্গ পাবার জন্যে ঘটে নি—ঘটেছিলো অন্য কারণে। বাইরে সেই বিশেষ লেখকের খুব নাম ডাক থাকলেও হঠাৎ তার বই-এর বিক্রী গেল কমে—এতো কমে গেল যে, লেখক এতদিন যেভাবে চলছিলেন সেভাবে আর চলতে এবং চালাতে পারলেন না। অগত্যা শুধু মান বাঁচাবার জন্যে—মানে সেই বাড়িতে বাস করবার জন্যে তাঁকে বন্ধুর সাহায্য নিতে হলো। অনেকের এমন হয়েছে। হঠাৎ শুনি অমুক লেখক চাকরি করছে কিংবা বই প্রকাশের ব্যবসা করছে নাহলে কোন প্রকাশকের মাইনে করা রীডার হয়েছে। বিলেতে এই রীডার হওয়ার রেওয়াজ অনেক দিনের। সাধারণতঃ প্রকাশকেরা প্রসিদ্ধ লেখকদের দিয়ে পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে তাদের মতামত নিয়ে তারপর তা মনোনীত করে। সেই লেখকরা হলো রীডার।

দেশের খরচপত্রের হালচাল বুঝে ইংরেজ লেখকের ঘরে উঁকি মেরে দেখলে সহজেই মনে হয় আমরা এদেশে বসে এতোদিন ভুল খবর শুনে ইংল্যাণ্ডে সার্থক জনম—গান করে অকারণে পুলকিত হয়েছি।

একটি ছোট গল্প লিখে তিনশো টাকা আর একটি উপন্যাস লিখে হাজার তিনেকের কাছাকাছি পারিশ্রমিক পেলেও সেদেশে বসে খুব অবাক হতে হয় না, কারণ এই সংখ্যাগুলির মূল্য ভারতবর্ষে যত বেশী—ইউরোপে ততো মোটেই নয়।

শুধু লেখকদের কথা কেন—আমরা যখন এদেশে বসে শুনি ইংল্যাণ্ডে একজন মজুরের সাপ্তাহিক আয় পাঁচ পাউণ্ড তখন এদেশের মজুরের কথা মনে করে দুঃখ বোধ করি। কিন্তু বিলিতি মজুরের সঙ্গে কিছুদিন বাস করলে সে ভুল হয়তো সহজেই ভেঙে যায়। কারণ সে-দেশের বেঁচে থাকার রীতির সঙ্গে তাল মেলাবার অনিবার্য তাগিদে সে-মজুর আর এ-মজুরে বিশেষ তফাৎ থাকে না।

লেখকদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। শুধু আমাদের বেঁচে থাকবার পদ্ধতির সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল তফাত। আমরা ছেঁড়া গেঞ্জি, ছেঁড়া কাঁথা আঁকড়ে এক ছোট ঘরে পাঁচ-ছ জন ঘেঁষাঘেঁষি করে গুমোট গরমে হাঁসফাঁস করি—প্রতিবাদের ভাষা যোগায় না। এমনভাবে বাস করবার কল্পনা ইংল্যাণ্ডের কোন লেখক দূরের কথা, সেখানকার ঝি-চাকরও করতে পারবে না।

আমরা প্রতিবাদ করি না, কারণ উপায় নেই। ইংরেজ লেখকের বেলায় প্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ এমন অবস্থায় তার বাস করবার কথাই ওঠে না।

কিন্তু একজন সাধারণ ইংরেজ লেখকের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের একজন ধরা-বাঁধা মাইনের সাধারণ কেরাণীর চেয়ে ভালো নয় বরং খারাপই বলা যায়, কারণ লেখকের আয় অনিশ্চিত। যদিও ভারতবর্ষে বসে আমরা ইংল্যাণ্ডের কেরাণীর উপার্জনের কথা শুনেও অবাক হই।

একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে যদি শুধু লিখে ভরণপোষণের খরচ চালানো যেতো তাহলে পৃথিবীর কোন লেখকই কোনদিনও চাকরি করতো না। যারা চালাতে পেরেছে তারা যে-দেশের লোকই হোক না কেন, ছোট্ট সুন্দর বাড়ি করে ফুল ফুটিয়েছে, গাড়িও চালিয়েছে। বাংলাদেশেও কি তেমন লেখকের সংখ্যা কম? হয়তো বাঙালী লেখককে পয়সা দিয়েছে ছায়াচিত্র আর ইংরেজ লেখককে নিশ্চিন্ত করেছে তার পৃথিবী-কথিত ভাষা। কিন্তু দু দেশের এই পর্যায়ের লেখকরা হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আমি তাদের কথা বাদ দিয়েই এতো কথা বললাম। আমি এতক্ষণ শুধু তাদের কথা বলছিলাম যারা সাধারণ এবং সবেমাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আরও একটা কথা। এ-দেশের লেখকদের অশান্তির মূল কারণ হয়তো শুধু অর্থাভাব আর অনিশ্চিত উপার্জ্জন। এ থেকে পৃথিবীর কোনো লেখকের মুক্তি নেই। কিন্তু ইংরেজ লেখকের আজকের সব চেয়ে বড় অশান্তি হলো তার অনিশ্চিত সংসার। যে কোনো মুহূর্তেই দীপ নিভে যেতে পারে, ঘর ভেঙে যেতে পারে। পারিবারিক কলহ, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা—তছনছ

করা সংসারের ভয়াবহ রূপ তাকে বার বার দিশেহারা করে। ইংল্যাণ্ডের এই ঘর-ভাঙা হয়তো খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু যেমন দেখেছি আর শুনেছি তাতে মনে হয় স্বভাবসুলভ কোমলতার জন্যে এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় লেখকদের। এই পারিবারিক গোলযোগ আর আকস্মিক বিচ্ছেদ তাদের পরবর্তী সাহিত্যের ধারা একেবারে ঘুরিয়ে দেয়। সাহিত্যিক কিংবা কবি জীবনের আরম্ভে যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, সহসা একদিন দেখা গেল মনের অশান্তি দূর করবার জন্যে সেই লেখক শুধু বাইবেল আঁকড়ে ধরেছে অর্থাৎ দেশের লোককে তিনি বোঝাবেন নিদারুণ পার্থিব অশান্তির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ।

আজ সারা ইউরোপের লেখকেরা একই ধ্বনি তুলেছেন—ঘর রাখো—যেমন করে হোক ঘর সামলাও। তা না হলে শান্তি নেই—শান্তি নেই। রাতারাতি কত লেখক যে হঠাৎ ক্যাথলিক হয়ে এই শান্তির বাণী প্রচার করেছেন তার ঠিক নেই। অর্থাৎ ধর্মে মন দাও তাহলে মিটমাট করে সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আর অসুবিধা হবে না। তুমি এ-জীবনের সুখশান্তি—কি পেলে আর কতটা না পেলে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না—তুমি রাত্রিদিন শুধু স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখে শান্তি পাবে।

এই তো সেদিন লণ্ডনের অলিম্পিয়ায় আদর্শ গৃহ প্রদর্শনী (Ideal Home Exhibition) হয়ে গেল। এমন মাঝে মাঝে হয়। কি দেখানো হয় সে প্রদর্শনীতে? নানারকম বাড়ি—কত সুন্দর ঘর আর এমন সব গৃহের ঝকঝকে সরঞ্জাম, যে দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। এইসব প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য হলো গৃহবিমুখ ইংরেজকে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করা। শুধ লেখক নয় ইংরেজ জনসাধারণ এই প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে তাদের সমস্তরকম কর্মক্ষমতা কমে যাবে। পারিবারিক অশান্তির আগুনে যে দিনরাত্রি জ্বলে মরে, বলা বাহুল্য তার দিশাহারা মন বেশী দিন সক্রিয় থাকে না, আর থাকলেও তার প্রকাশ হয় পঙ্গু।

কিন্তু আর একদল অন্য কথা বলে। ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিক-বিরোধী কিংবা

অন্য কোন মতাবলম্বী লেখক এসব কথায় কান না দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, ঘর-ভাঙার মূল কারণ কী? অভাব। কিসের অভাব? না, অর্থের। তাই শুধু চোখ কান বুজে স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস করলে ঠকে মরতে হবে—সাহিত্যের যুক্তি প্রবল হবে না। তার চেয়ে অভাব দূর করবার চেষ্টা এবং যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের হুবহু ছবি পাঠকের সামনে মেলে ধরতে হবে। শুধু সাংসারিক গোলযোগে, নিজের ব্যক্তিগত দৈন্যে যে লেখকের লেখনী দিশা হারায় এ সমাজে তার মূল্য নেই, প্রয়োজনও নেই—সে-লেখক নির্বোধ কারণ এই সমাজ-সচেতনতার যুগে সে পাঠককে শুধু ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। ইংরেজ লেখকদের মধ্যেও এমনি দলাদলি কচাকচি তর্ক-বিতর্ক বিলক্ষণ চলে!

তা চলুক। বর্তমান আলোচনার পরিসরে তার অবতারণা এ লেখককেও দিশেহারা করে আসল বক্তব্য ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই সতর্ক হই।

যা বলছিলাম। আর্থিক, পারিবারিক এবং ফলে মানসিক—এই অশান্তি ইংরেজ লেখককে দিশেহারা করে। কিন্তু এতো অন্ধকারেও সুখের বিষয় যে ইংরেজ লেখক শুধু টাকার জন্যে নিজের রচনাকে বিকৃত করে না। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমাদের দেশের লেখকেরা যখন ছায়াচিত্রে যোগদান করেন তখন দিনের আলোয় পাঁচজনের মাঝে তাঁরা স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে আর কোন উৎসাহ ছায়াচিত্র সম্পর্কে তাঁর নেই, শুধু অর্থের জন্যেই তাঁকে এই কাজ করতে হলো। কোন ইংরেজ লেখক কখনও এমন ঘোষণা করবে না। অর্থের প্রতি তার নিঃসন্দেহে লোভ আছে এবং অর্থকরী মাধ্যমের সাহায্য নিতে তারা কুণ্ঠিত নয় কিন্তু যখন তারা সে-কাজ গ্রহণ করে তখন মনেপ্রাণে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই করে যে ফাঁকি দেবো না—আমার কথায় কিংবা কাজে মুহূর্তের জন্যেও কোন অবহেলা প্রকাশ পাবে না। আর তারা যা জানে না তা (চিত্রনাট্য রচনা ইত্যাদি) শিখে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। অবশেষে যদি বোঝে যে কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে সে-কাজ তাকে দিয়ে সার্থক কি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না তাহলে সেখান থেকে সে নিঃশব্দে প্রস্থান করে—পাঠক কি দর্শককে ধাপ্পা দিয়ে দুপয়সা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে না।

লেখার ব্যাপারেও ঠিক তাই। প্রকাশক চেক বই পকেটে নিয়ে হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও লেখকের ভালো লেখবার মেজাজ না থাকলে একটি লাইনও সে পাবে না। সে তার সাধ্যমতো ভালো লেখবার চেষ্টা করবে—যদি না পারে স্পষ্ট বলে দেবে, মাপ করো—এখন হবে না।

আমার মনে হয় এইখানেই ইংরেজ লেখকের সঙ্গে আমাদের দেশের লেখকের সবচেয়ে বড় তফাত। মাথায় সেই মুহূর্তে কিছু না থাকলেও পকেটে চেক বইওয়ালা প্রকাশককে আমরা কজন ফেরাই? চিত্রনাট্য রচনার বিন্দুবিসর্গ না জানলেও আমাদের মধ্যে কে আর 'জানি না' বলে তিন-চার হাজার দেবো বলনেওয়ালা ডিরেক্টার সাহেবকে নিরাশ করেন? তাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অর্থলাভ করেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রতি নিযুক্ত সেক্রেটারীর সঙ্গে নিজের নতুন মোটর গাড়িতে ধুমধাড়াক্কা করে স্যুটিং-এর কাজ চুকিয়ে স্টুডিও থেকে বেরুবার সময় তাঁর নিজের কি মনে হয় জানি না কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ লেখকের সাহিত্যপ্রতিভার একেবারে অবসান হয়েছে আর ডিরেক্টার এবং প্রযোজকের দল ভাবে, বাংলাদেশের নাম করা সাহিত্যিককে এনে ফিল্মের কি উন্নতি হলো—তা যেখানে ছিলো সাহিত্যিক মশাই তো সেখান থেকে আরও কয়েকধাপ নামিয়ে দিলো! ইংরেজ লেখককে এমন কথা শুনতে হয় না। ইংরেজ লেখক কুলিগিরি করতে পারে, খনিতে কাজ করতে পারে, সদাগরী কিংবা খবরের কাগজের আপিসে চাকরি নিতে পারে কিন্তু যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সে এক মুহূর্তের জন্যে ভুলবে না যে সে সাহিত্যিক, আর করবে না তার প্রতিভার অপচয়—যা করবে তা সমস্ত শক্তি দিয়েই করবে—নিষ্ঠাবান থাকবে—আত্মসম্মান বজায় রেখে পদে পদে প্রমাণ দেবে যে সে সত্যভ্রষ্ট নয়। অর্থের প্রচুর প্রয়োজন থাকলেও তার জন্যে বিস্মৃত হবে না নিজেকে।

শেষ করবার আগে একটি ছোট সত্য ঘটনার উল্লেখ করবো। শীতকাল। বাইরে বেশ বরফ পড়ছে। টটনহ্যাম কোর্ট রোডের একটি দিশি রেস্তোরাঁয় পোলাও মাংসের অর্ডার দিয়ে চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ সাহিত্যের

আলোচনা শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা আর একজন তরুণ ইংরেজ দিশি খাওয়া খেতে খেতে কথাবার্তা বলছে। যতদূর মনে আছে তাদের আলোচনার সারাংশ তুলে দিলাম—

ভদ্রমহিলা বললেন, কি ঠিক করলে ?

হেসে তরুণ উত্তর দিলো, কোন উপায় নেই—এখন অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু তুমি ফিল্মের চাকরিটা নিচ্ছ না কেন—তাহলে তো একটা বাঁধা মাইনে পেতে ?

আপনি তো জানেন আমি একেবারেই ছবির জন্যে লিখতে পারি না।

কিন্তু গল্প তো লিখতে পারো—তাতেই হবে। তোমাকে তো আর মৌলিক কিছু লিখতে হবে না—অন্য লেখার চিত্ররূপ দিতে হবে শুধু।

তাও পারবো না—তার চেয়ে ভাবছি ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে একটা চাকরি নেবো।

তোমার ছোটগল্পগুলির কি হলো ? এদিক-ওদিক তো অনেক বেরিয়েছে দেখছি।

দুচার জায়গায় কথা বলেছিলাম। কোন প্রকাশক নিতে চায় না। সকলেই উপন্যাস চায়। এক প্রকাশক অনেকদিন পাণ্ডুলিপি আটকে রেখে শেষে ফেরত দিলো।

এখনও বলছি, সিনেমার চাকরিটা নিয়ে নাও—বল তো কাল কথাবার্তা পাকা করে ফেলি—

না থাক! ধন্যবাদ।

দুজনের মধ্যে একজন বর্তমান লণ্ডন ছায়াচিত্রের নামকরা অভিনেত্রী আর একজন বলা বাহুল্য নতুন লেখক। দুজনের নাম আমার জানা কিন্তু করতে পারবো না, কারণ—

কিন্তু কারণ বলেই বা লাভ কি ?

❋ ❋ ❋ সপ্তাহশেষের ইংল্যাণ্ড ❋ ❋ ❋

শীতের সকালে একদিন দেখি পথে প্রান্তরে আর পার্কে পার্কে জমা হয়ে আছে পুরু তুষার। কাল সারারাত ব্লিজার্ড বয়ে গেছে—আজ তারই চিহ্ন যেন ছড়িয়ে গেছে মাঠে, পত্রহীন মূক গাছের শাখা-প্রশাখায় আর যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর।

পাখি উড়ে গেছে। একে একে শুকিয়েছে ফুল। পাতারা ঝরে গেছে। শীতের কঠিন স্পর্শ লেগেছে। নিঃস্ব, রিক্ত প্রকৃতি যেন আতঙ্কে বিহ্বল। রোদ নেই। বিলাসী ম্লান সূর্যের ক্ষণকালের জন্যও দেখা পাওয়া কঠিন। শুধু ঝরা তুষার ভেদ করে উঠেছে কান্নার রেশের মত সিক্ত ধূম। বাইরে আনন্দ নেই, কোলাহল নেই, পরিত্যক্ত মাঠ-ময়দান, পরিত্যক্ত সাঁতার কাটবার দীঘি-সরোবর।

মানুষগুলো যেন মৃতপ্রায়। মুখে হতাশা আর বিরক্তি, লণ্ডন ব্রিজের ওপর দ্রুতগামী বাসে নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের মতো লোকগুলোকে যেন বোবা বলে মনে হয়। তুষার বাঁচিয়ে অতি দ্রুত কর্মস্থলে পৌঁছানো আর সেখান থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে গৃহে ফিরে আসা। জীবনে যেন আর কিছুই করবার নেই। যখন তারা মুখ খোলে তখনও তোতাপাখির মতো সেই একই কথা শুনি, কী কনকনে ঠাণ্ডা! কী অসহ্য দিন!

বাইরের পৃথিবী থেকে গৃহস্থকে একরকম বিচ্ছিন্ন হতে হলো। সংসারের খরচ বাড়তে লাগলো দিনে দিনে। মেয়ের কোট, ছেলের বুট, গিন্নীর ওভার-কোট, কর্তার গরম গেঞ্জি, কয়লা গ্যাস ইত্যাদি ব্যয়ের বাহুল্যে বিব্রত হলো জনসাধারণ। দরিদ্র, আর মধ্যবিত্ত ইংল্যাণ্ডবাসীর বড়-আশা-করা শনিবার-রবিবার অর্থাৎ উইক-এণ্ড দীর্ঘকাল ধরে বৃথাই এলো গেলো।

ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র জনসাধারণ শীতে কোনরকমে কাল কাটায়। হাসি-মিলিয়ে যায় ওদের। আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তায় মন ভরে থাকে। কোন

কিছুতেই যেন উৎসাহ থাকে না। কেবলই প্রহর গোণে, কবে আবার শুরু হবে অঙ্গনে রবিনের আনাগোনা, কবে আবার প্রকৃতি ফোটাবে ফুল আর সপ্তাহশেষে গৃহকোণে উঠবে আনন্দধ্বনি!

কেন এই আনন্দ? সূর্য ঝলমল করা দিনে কেন পথে পথে দেখি হাসিভরা মুখ আর অনুভব করি দরিদ্রের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ? কারণ অনেকদিন কষ্ট সহ্য করবার পর তারা সূর্যকে পেয়েছে। যাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, যাদের সুখভোগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, তাদের বারবার জীবনের উপর ধিক্কার জেগেছে অলস কঠিন শীতের দুপুরে। তাই শীতের সপ্তাহশেষ কলরবহীন। বিরক্তির বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নেই।

গ্রীষ্মের সপ্তাহশেষ বোধহয় ইংরেজ জনসাধারণের বেঁচে থাকবার সবচেয়ে বড় সম্বল। যারা বড়লোক, তাদের কথা নয়, তারা চলে যায় সমুদ্রতীরে রিভিয়ারায় মধু-যামিনীর উৎসবে কিংবা নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্কে। কিন্তু যাদের দূরে যাবার সামর্থ্য নেই, সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি অন্নচিন্তায় যারা নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পায় না, তারা বুক ভরে উপভোগ করে সপ্তাহশেষের আনন্দোল্লাস। প্রতি সপ্তাহে তারা পায় ভ্রমণের আনন্দ, অল্প দিয়েই ভরে রাখে সংসার—যতদিন গ্রীষ্ম থাকে ততদিন।

ইংরেজ এককথায় দিশেহারা হয়ে অভাবকে সুযোগ দেয় না সংসারের সমস্ত সুখ-শান্তি গ্রাস করে নিতে। হাজার অভাবের মধ্যেও ইংরেজ হাসিমুখে ফুল ফোটায়। প্রাণপণে সাধ্যমতো আনন্দ উপভোগ করে। যতটুকু পায়, যেটুকু সামর্থ্যে কুলোয় তাই প্রাণভরে গ্রহণ করে। কি পেতে পারলো না, কতখানি বঞ্চিত হলো, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গুমরে মরে না। পাওনা তোলা রইলো ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু যতটুকু পেলো তাই থেকে মধু আহরণ করলো সযত্নে। আরও না পাওয়ার দুঃসহ কল্পনায় ব্যর্থ হতে দিলো না তার সামান্য এক কণাও। উপায় যখন নেই, তখন যা পেয়েছি তা থেকেই খুঁজে পেতে হবে মণিকণিকা। তাই ইংরেজ মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, স্বল্পবাক্। ইংরেজের ধর্ম উপভোগ—অনুযোগ নয়, অনুতাপ নয়।

আমরা অনেক সময় ভাবি, ইংল্যাণ্ডবাসী-মাত্রেই আমাদের চেয়ে ধনী। মানে আমাদের দেশের কুলি-কেরানীর চেয়ে তাদের কুলি-কেরানীর অবস্থা অনেক ভালো। কারণ ওরা সপ্তাহে খুব কম করেও প্রায় পঁয়ষট্টি সত্তর টাকা উপার্জন করে। তাই হঠাৎ ওদেশের ওই শ্রেণীর লোক দেখলে আমরা নিজের দেশের সঙ্গে ওদের তুলনা না করে পারি না। আর ভাবি দুই দেশের সামাজিক মানদণ্ডে কি আশ্চর্য প্রভেদ!

কিন্তু তাদের সংসারে প্রবেশ করে চারপাশে চোখ মেলে তাকালে ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। ওদের তুলনায় নিঃসন্দেহে আমাদের আয় সামান্য, প্রয়োজনও সামান্য। ওদের আয় বেশি, কিন্তু আমাদের তুলনায় ব্যয়ও প্রচুর। ওদের ঘরভাড়া বেশি, জামা-কাপড়ের প্রয়োজন বেশি, আর ওদের সংসারের অন্যান্য দাবির তুলনায় আমাদের সংসারের দাবি হয়তো কিছুই নয়।

কিন্তু ওদের অভাবের কথা বিদেশী কেমন করে বুঝবে! সপ্তাহশেষে যখন যেখানে গেছি, দেখেছি আনন্দের আয়োজন—দেখেছি খুশিতে ঝলমল করা মুখ। তখন একবারও মনে হয় নি যে, ইংল্যাণ্ডের কোথাও কোনরকম দুঃখ-দারিদ্র্য আছে। অভাবকে আনন্দের সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে আবৃত করে, প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বেঁচে থাকবার কৌশল বোধ হয় একমাত্র ইংরেজ জাতই জানে। নাই-বা গেল কর্নওয়ালে, নাই-বা যেতে পারলো আইল্ অব ওয়াইটে—তার জন্যে দুঃখ করে লাভ কি! ঘরের বাইরে দুই পা ফেলেই যোগ দিতে হবে আলোর উৎসবে। বাড়ির কাছে থেকেই সেই দেড়দিনে করে নেবে আগামী সাড়ে পাঁচ দিন পূর্ণ উৎসাহে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয়। কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবে না গ্রীষ্মের সপ্তাহশেষ।

শনিবার সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ইংরেজ-গিন্নী। নাকে মুখে ব্রেকফাস্ট গুঁজে একটু আগে কর্তা বেরিয়ে গেছে কোন সওদাগরী অপিসে কেরানীগিরি করতে; কিন্তু আজ আর বাইরে লাঞ্চ খাবে না। দেড়টার মধ্যে বাড়ি এসে পড়বে।

প্রতি শুক্রবার ইংল্যাণ্ডে মাইনে পাবার দিন। কাল হাতে টাকা পাওয়া

গেছে। তাই আজ খুশিমতো বাজার করতে গিন্নীর অসুবিধা হয় নি। ভেড়ার মাংস কিনেছে, আলু পেঁয়াজ মটরশুটি এনেছে, ক্যারটও আনতে হয়েছে প্রচুর।

ছেলেমেয়ে দুটি মায়ের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছে। ওরা জানে আজ মা-বাবার সঙ্গে বের হবার দিন।

কটা বেজেছে মা?

বারোটা—মা তাড়া দিয়ে মেয়েকে বলে—

যা জামাকাপড় পড়ে নে শিগগির, দেরি করলে নিয়ে যাবো না কিন্তু—

ছেলে এবার কাছে এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে,—আজ কোথায় যাবো মা?

মা হেসে উত্তর দেয়, হ্যামটন কোর্ট।

যথাসময়ে কর্তা বাড়ি এলো। গিন্নী টেবিল সাজিয়ে রেখেছে এর মধ্যেই। আয়েশ করে গরম গরম খাওয়া সেরে নিতে দেরি হলো না। তারপর বের হবার পালা। গিন্নী যা কিছু দরকারী জিনিস, হয় ব্যাগে নয় ঝুড়িতে ভরে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। আজ তাদের এই এক বেলাই ভালো খাওয়া জুটলো। রাত্তিরে এত ভালো খাওয়ার আর উপায় নেই। অর্থ নেই যথেষ্ট। তাই দুবেলা আয়েশ করে খাওয়া যায় না। গিন্নী ব্যাগে ভরে নিয়েছে স্যাণ্ডউইচ, ফ্লাস্কে নিয়েছে চা কিংবা কফি। সন্ধ্যার সময় ফেরবার আগে যখন খিদে পাবে, তখন মাঠে কিংবা গাছতলায় বসে তৃপ্তির সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেট ভরাতে হবে।

ওদিকে ইস্ট এণ্ডের জীর্ণ ঘরে গরিব শিল্পীও গুছিয়ে নিলো তুলি আর আঁকবার নানা জিনিসপত্র। তারপর শুকনো খাবার বেঁধে বেরিয়ে পড়লো; কোথায় যাবে ঠিক নেই। কাছাকাছি কোন পার্কে কিংবা আর একটু দূরে—এপিং জাঙ্গলে। টিউবে যেতে কতক্ষণই বা সময় লাগে। গভীর জঙ্গল, কিন্তু এখানে সময় কাটাতে আসে অনেক লোক। আর কিছু দেখা যায় না—শুধু ঘন অরণ্যে গাছের সারি, পাতার মর্মর আর পাখির কলরব। চারপাশ সযত্নে

পরিষ্কার করে বসবার জায়গা করা হয়েছে। সূর্যের আলো বাধা পায় না। সেই এপিং জাঙ্গলে খেলা করে গান গেয়ে আর ছবি এঁকে শিল্পী কাটাবে আজ সারা দিন। তারপর অনেক পরে যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে দীর্ঘকাল-স্থায়ী গোধূলী, আর অন্ধকার দানা বাঁধতে শুরু করবে গাছে গাছে, তখন জীর্ণ গ্যারেটে ফিরে মূর্ত হয়ে উঠবে সেই তরুণ শিল্পীর সতেজ মনের কল্পনা।

আর নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের যে মেয়েটি বীমা কোম্পানীর টাইপিস্ট—আজ তারও বড় আনন্দের দিন। তার সঙ্গে যার বিয়ে হবে—আজ তার সঙ্গে দেখা হবার দিন। কোন হোটেলে খাবার ক্ষমতা নেই তাদের। খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ছেলেটি সামান্য চাকরি করে—ভালো করে উন্নতি না হলে বিয়ে হতে পারে না তাদের। সংসারে মেয়েটিকে অনেক দিতে হয়, ছেলেটিরও রয়েছে অথর্ব বুড়ি মা আর নানা উপরি দেনা। কিন্তু আজ সেকথা কারো মনে থাকবে না। ক্ষণকালের জন্যে তারা সব ভুলে যাবে। হ্যাম্পস্টেড্ হীথের অজস্র আলোয় নিরলস মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে তারা পাবে ভ্রমণের আনন্দ—শক্তি লাভ করবে সংগ্রামের। অভাব আর অশান্তির মধ্যেও তারা যতোটুকু পাবে, আশ মিটিয়ে গ্রহণ করবে। বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে না কেউ।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে, যেখানে রয়েছে পাথরের বিরাট বিরাট সিংহ—যেখানে মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় অসংখ্য পায়রার দল, আর ডাকলেই হাতে কিংবা কাঁধে এসে বসে, সেখানে সপ্তাহ শেষের অপরাহ্নে দেখি সেজেগুজে বসে আছে মেথর আর মেথরানী। দীর্ঘদিন ছুটি নিয়ে দূরে হাওয়া খেতে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না তারা। তবু ঘরে গুম হয়ে বসে থেকে বিরস করে তোলে না মুহূর্তগুলি—দূরে যেতে পারলো না বলে দুঃখ করে না। ঘরের পাশে চোখ মেলে সুন্দর পৃথিবীকে দেখবার মত মন তাদের আছে।

তাছাড়া রিজেণ্টস কিংবা হাইড পার্কে নৌকো বাওয়া চলেছে।, সেখানে রয়েছে হ্রদ। ঘণ্টায় ক শিলিং দিলে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। দলে দলে ছেলেমেয়ে সেখানে নৌকো বাইছে। আর সন্তরণ সরোবরে সুইমিং কস্ট্যুম

পরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর-নারী। টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে ছুটে চলেছে কত লোক। সূর্যের তাজা আলোয় গলফ খেলায় মেতে উঠেছে অনেকে। আরও নানা সুলভ আনন্দ কৌতুকের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে ওখানে।

সর্বত্র দেখছি জনতার দুরন্ত উল্লাস আর উচ্ছ্বাস। বাপ-মা, ছেলেমেয়ে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী, সকলেই বেরিয়ে পড়েছে স্বল্প ব্যয়ে পূর্ণ আনন্দ পেতে। এদের সকলের সংসারে অভাব আছে, অনটন আছে, নানারকম দুঃখ-কষ্ট তো আছেই। কিন্তু জীবনের পূর্ণ জোয়ারে তারা যেন ভুলে গেছে সমস্ত অভাব। সপ্তাহ-শেষের খুশি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

হ্যাম্পস্টেড্ হীথের গাছে গাছে যখন অসংখ্য গন্ধহীন রঙ-বেরঙের ফুল ফোটে, কিউ গার্ডেনস-এ যখন আলোর বন্যা বয়ে যায়, হ্যাম্পটন কোর্ট আর উইণ্ডসর ক্যাসেল সূর্যের আলো পেয়ে যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফেরে এপিং জাঙ্গলের গাছে গাছে, তখন তাদের কাছে গিয়ে দরিদ্র ইংল্যাণ্ডবাসীর পক্ষে, সে সৌন্দর্যলোকে হৃদয় পূর্ণ করবার শ্রেষ্ঠ সময় সপ্তাহ-শেষ।

আজ সবদিক থেকেই ইংরেজের দৈন্য বেড়ে গেছে। কত ঘরে অশান্তি দিয়েছে যুদ্ধ—মূর্ত করেছে নানা অভাব। সংসারের অনটনের চাপে অন্যত্র সুখ পাবার আশায় কত গৃহস্থ-বধূ ঘর ছেড়ে গেছে। কোথাও শান্তি নেই, কোথাও সুখ নেই, তেমন করে বেঁচে থাকবার মতো অর্থও নেই সংসারে।

কিন্তু কি আছে তাদের? শীতের সময় যাদের মৃতপ্রায় মনে হয়েছিলো, গ্রীষ্মের সপ্তাহ-শেষে দেখি তাদের আছে প্রাণের প্রাচুর্য। নিজেকে প্রশ্ন করি, এতো প্রাণ-শক্তি ইংরেজ পেলো কোথা থেকে—এই দৃঢ়তা কে দিলো তাদের? উত্তরে ভাবি, হয়তো প্রকৃতি।

কঠিন শীতের পর সহসা একদিন ফুল ফুটে উঠলো, তাজা রোদ্দুরে ঝলমল করে উঠলো পত্রগুচ্ছ, আর ছোট বড় সকলেরই মনে হলো, আমরাও বেঁচে আছি।

অভাব তাদের ক্ষত-বিক্ষত করতে পারলো না, অশান্তি তাদের বিচলিত করলো না, যুদ্ধ তাদের প্রাণ-শক্তি ক্ষয় করতে সক্ষম হলো না!

যা গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, যা পেতে পারবো না তার ভাবনায় যা আছে তা নষ্ট হবে না—যা রইলো তাই ফুল হয়ে ফুটে উঠুক—তাই হোক সোনা।

সপ্তাহ-শেষে ইংল্যাণ্ডের ঘরে বাইরে দেখা যায় এই স্বল্প পুঁজি নিয়ে আনন্দ বাড়াবার প্রাণপণ আয়োজন।

ইউরোপ ও
* * * ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ * * *

ভারতবর্ষের কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক যদি দেশে বসে মনে করেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভালো রচনা ভাষান্তরে ইউরোপে প্রকাশিত হলে সেখানেও তিনি সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন তাহলে হয়তো তাঁকে হতাশ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমাদের দেশে যতোখানি খ্যাতি লাভ করেছেন, ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে তার শতাংশের একাংশও পান নি—শরৎচন্দ্র তো প্রায় অপরিচিত থেকে গেছেন।

সুইডেনের কোন লেখক কিংবা ডেনমার্কের কোনো কবি নোবেল প্রাইজ পেলে তার কথা উল্লেখ করে আমরা প্রায়ই মন্তব্য করি, এমন লেখকও নোবেল প্রাইজ পেল! এর চেয়ে লাখো গুণে ভালো লেখক তো আমাদের দেশে কতো রয়েছে—তাঁরা নোবেল প্রাইজ পায় না শুধু ভারতীয় বলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। ভারতীয় লেখক! তাঁর সমাজ, ভাবনা চিন্তা—এসমস্তর সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজের আগাগোড়া অমিল। বাংলা থেকে ইংরেজী করার অর্থ শুধু ধরে ধরে অনুবাদ করা নয়; এই অমিল, এই প্রভেদ ঘুচিয়ে অন্য ভাষায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা। সেকাজ একমাত্র তিনিই পারেন যিনি সাহিত্যিক এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সমাজের অলিগলি যাঁর নখদর্পণে।

অনেক ভারতীয় লেখক মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন, আমার অমুক লেখা ইংরেজীতে বেরুচ্ছে হে, পড়ে দেখো, অনুবাদ করেছে একেবারে খাঁটি ইংরেজ। যেন এবার তাঁর বিশ্ব-বিজয় রোধ করবে কে!

কিন্তু শেষ অবধি ফল হয় না কিছুই। ইংরেজকৃত অনুবাদ ইংরেজ পাঠকের কাছেই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। একটি কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করে

পারলুম না। মনে করুন কোন ইংরেজ লেখক এদেশে এলেন এবং হাওড়ার উকিলবাবুর ওপর তাঁর উপন্যাস অনুবাদ করবার ভার দিলেন যেহেতু হাওড়ার উকিলবাবুর একমাত্র গুণ তিনি বাঙালী। সাহিত্যিক না হয়ে ইংরেজ লেখকের অনুবাদের ভার নিয়ে বাঙলার পাঠকের কাছে কি জিনিস তিনি পরিবেশন করবেন আশা করি সেকথা আরও স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন নেই। একজন অসাহিত্যিক ইংরেজও ঠিক এই কাজ করেন। যুদ্ধের সময় একথার প্রমাণ তো এই কলকাতা শহরে বসেই আমরা পেয়েছি। যখন অসাহিত্যিক ইংরেজ যোদ্ধা মাত্র দুবছরে বাংলা শিখে বাংলার প্রসিদ্ধ কবিদের সহযোগিতায় ইংরেজীতে তাঁদের কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি আর কিছুই করেন নি—শুধু লাইন ধরে ধরে বাংলা থেকে ইংরেজী করেছিলেন। আমরা সকলেই তাই করি—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেক ভারতীয় লেখকের বেলায় ঠিক তাই করা হয়েছিলো। যে অংশ ইংরেজীতে একেবারে অচল, যা নির্মমভাবে সে-ভাষায় বর্জন করা উচিত আমরা সে অংশ লেখকের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে সযত্নে প্রচুর পরিশ্রম করে ভাষান্তরে বিকৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের কবিতার একটি লাইন 'এসো পাপ এসো সুন্দরী—' ইংরেজীতে করা হয়েছে, 'Come Sin, O Beautiful—' ইংরেজ পাঠক এ থেকে কি পাবে?

এমন অনেক লাইন, এমন অনেক অংশ, এমন অনেক গল্প-উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ যা হয় একেবারে বাদ দিতে হবে, নয় যথার্থ অর্থ-বহ করে ইউরোপে পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু কোন্ রচনা বিদেশী পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে গৃহীত হবে তা মনোনীত করবেন কে?

কোনো দেশের কোনো ভালো রচনাই ফেলা যায় না, অনাদরে বিদেশের পাঠকের কাছে অবহেলা পায় না, শুধু জানা চাই দেশবিশেষে পরিবেশনের রীতিনীতি—কলাকৌশল।

অনেক ভারতীয় লেখকের অনেক প্রথম শ্রেণীর রচনা ইংল্যাণ্ডে আদর পায় নি কিন্তু ফ্রান্সে কিংবা ইউরোপের অন্যান্য কণ্টিনেণ্টে আন্দোলন এনেছে।

এর কারণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ইংরেজীতে ভারতীয় অনুবাদকের অক্ষমতার জন্যে যা ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারে নি—তাই যথার্থ রূপ নিয়েছে ফরাসী কিংবা জার্মান অনুবাদকের হাতে পড়ে ; কেন না তাঁরা দুর্বল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করলেও নিজেদের ভাষায় সেই বিষয়বস্তুর যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন। আরও একটা কথা, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তাধারার প্রচুর অমিল থাকলেও কন্টিনেন্টের সঙ্গে অনেক মিল, তাই সেখানে ভারতীয় লেখকের পক্ষে খ্যাতি লাভ করা ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক সহজ।

একটা কথা প্রায় শুনি—ইউনিভারসেল অ্যাপিল এবং শরৎচন্দ্রের সেটা ছিলো না বলেই নাকি তিনি বিশ্ববিজয় করতে পারেন নি।

একথা সব সময় মেনে নিতে কোথায় যেন বেধে যায়। বিদেশী পাঠক সব সময় চেনা চরিত্র চায় না, কিন্তু পেলে খুশী হয়, আর অজানা চরিত্র কিংবা দেশবিদেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধেও তার কৌতূহল কম নয়। শরৎচন্দ্র যদি নিজে কিছুদিন ইউরোপে বাস করতেন এবং সেখানকার হালচাল বুঝে রচনার অংশবিশেষ একটু এদিক ওদিক করে অনুবাদ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করতেন তাহলে 'ইউনিভারসেল অ্যাপিল' কথাটির অসারত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়ে যেতো! লেখক স্বয়ং ইউরোপে উপস্থিত থাকলে তাঁর প্রিয় বহু বিদেশী সাহিত্যিকের সহযোগিতায় সাথক অনুবাদের বন্দোবস্ত করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যতোবার তা করেছেন ততোবার কৃতকার্য হয়েছেন আর যখনই তা করেন নি তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্রের কথা কেন, ভারতবর্ষের যে কোন লেখক অনুবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেত গেছেন তাঁরা ক্ষমতা অনুসারে যশোলাভ করেছেন বৈকি। কেউ কেউ ক্ষমতার চেয়ে বেশি প্রশংসালাভ করেছেন, শুধু শক্তিশালী সাহিত্যিক অনুবাদকের জন্যে।

ভারতীয় লেখক যদি নিজেকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করতে চান তাহলে তাঁকে স্বয়ং সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে যেতে হবেই। সেদেশের পাঠকের রুচি তাঁর মতো সহজে আর কে বুঝবে! নিশ্চয়ই সেই রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি ফরমায়েসী সাহিত্য সৃষ্টি করবেন না, কিন্তু বুঝে নেবেন তাঁর পুরানো রচনার

কোথায় কোন্ অংশ কিভাবে বর্জন করবেন আর স্থান-কাল-পাত্রের কথা স্মরণ করে কোন্ নতুন কথা প্রয়োগ করে ইংরেজ সাহিত্য-রসিক বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতায় সার্থক অনুবাদ প্রকাশ করবেন।

এই বন্ধু নির্বাচন আর এক সমস্যা। বিলেত যাবার আগে অনেকে গায়ে পড়ে বলেন, দেবো কতকগুলো চিঠি দিয়ে, আলাপ করবেন গিয়ে—। কিন্তু কার সঙ্গে আলাপ করবো? মনের মতো লোক তো আপনিই জুটে যাবে। আর যদি না জোটে তাহলে আমার দুর্ভাগ্য।

এই মনের মতো লোক জোটাতেই যা কালক্ষয়। তারপর যদি খবর রটে যে আপনি ভারতবর্ষের লেখক তখন শিক্ষিত কৌতূহলী বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা আপনার দিনে দিনে বেড়ে যাবে। লেখক না হলেও ক্ষতি নেই, তারা যদি সাহিত্যে উৎসাহী হয় তা হলেই কাজ চলে যাবে আপনার। এরা যদি আপনার ভাষা না জানে তা হলেও কিছু এসে যায় না—আপনি আপনার দীর্ঘ উপন্যাস তখন তখন করা ইংরেজীতে তাদের পড়ে শোনালেন—তারপর যখন তারা বিষয়বস্তু বুঝতে পারলো, গ্রহণ করলো উপন্যাসের মূল সুর তখন তারাই আপনার ভাষা না জানলেও আপনাকে সাহায্য করবে অনুবাদ করতে—আপনার বলা ইংরেজীর প্যারাগ্রাফকে প্যারাগ্রাফ সংশোধন করে তারা তাদের ইংরেজী বসিয়ে দেবে। বই প্রকাশিত হলে আপনি অবশ্য উল্লেখ করলেন, Translated from Bengali by the author in collaboration with—নাম রইলো আপনার বন্ধু কিংবা বান্ধবীর।

এ কাজ দেশে বসে কিছুতেই হয় না। কারণ, যিনি ভালো ইংরেজী জানেন, তিনি হয়তো আপনার লেখা ভালোবাসেন না। আর এদেশ থেকে ইউরোপে আপনার অপরিচিত প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েও বিশেস ফল হয় না। দূরত্বের অসুবিধা অনেক, আর যতো ভালো ইংরেজী আপনি লিখুন না কেন, ওদেশের সাহিত্যিক ও প্রকাশকের সঙ্গে সহযোগিতায় অনুবাদ করলে আপনি যতো সুযোগ-সুবিধা পাবেন, দেশে বসে তার কিছুই আপনি পেতে পারেন না। 'ব্যস, ইংরেজীতে অনুবাদ হলেই হলো—আর কিছু না করে

আপনি যদি চুপ করে বসে থাকেন তাহলেও আপনার প্রকাশক উৎসাহ নিয়ে ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় আপনার লেখা প্রকাশিত করিয়ে দেবেন। আপনার আর কোনো পরিশ্রম করবার দরকার নেই—কেননা বহুল উচ্চারিত ইংরেজী ভাষায় আপনার বই যখন বেরিয়েছে তখন আপনার নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে আর যে ভাষা অনেক ফরাসী জার্মান ও কণ্টিনেণ্টের অন্যান্য জাতির বোধগম্য। পর পর এমন কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হলেই দেশে ফিরে একদিন আপনি দেখবেন সামান্য কষ্ট সহ্য করে ইউরোপ ভ্রমণ আপনার জীবনে কতোখানি সার্থকতা এনেছে।

ইউরোপের সমুদ্রতীর

তারপর একসময় যখন রোদ্দুরের তাপ বড় বেশী প্রখর মনে হয় তখন প্রচুর অনিচ্ছায় ক্লান্ত দেহ নিয়ে আস্তে উঠে বসি। আর আপন মনে অলস চোখ ফিরিয়ে দেখি কোথাও যেন আর এতটুকু জায়গা নেই। আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কিছুক্ষণ আগেকার-দেখা শূন্য স্থান ভরে উঠেছে সুইমিং কস্ট্যুম পরা অসংখ্য স্নানবিলাসী নরনারীর অলস-শয়নে। অবসর যেন রঙ-বেরঙের ফুল হয়ে ফুটে উঠল ইউরোপের এই সমুদ্রতীরে।

বারো মাস আগে কবে ঝরে পড়েছিল এমনি সোনা-ঝলমল-করা দীর্ঘ পরিপূর্ণ দিন, শীতের কঠিন আঘাতে অবসন্ন আর কুয়াশার সেই একটানা অন্ধকারে পথ-চলা পরিশ্রান্ত পথিকের সে কথা তো মনে রাখবার কথা নয়। তাই মনে হয়, এমন করে এ-দিনের এই তুষার ঘেরা দেশে আসবার কথা ছিলো না—প্রকৃতির এই অকৃপণ উপহার যেন আকস্মিক—ব্যর্থ হবে না, বিফলে যাবে না, পথ-ভুলে-আসা হঠাৎ-দিনের একটি কণারও করা হবে না অপচয়। ইউরোপের জনসাধারণ যেন পণ করেছে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে—অসীম শৈথিল্য দিয়ে উপভোগ করতে হবে প্রকৃতির হঠাৎ-ছড়ানো মুহূর্তগুলিকে। তারপর আসে এমনি আরও দিন—একের পর এক, অনেক। পথে ঘাটে হাটে—দিনের আলোয় যখন যেখানে যাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, এক মুখ হাসি নিয়ে সে শুধু বলে, সুন্দর দিন! কী উজ্জ্বল! অপরূপ!

ইউরোপের গ্রীষ্ম দিশা-হারানোর কাল। ব্যবসায়ী ইংরেজের মনেও ক্ষণকালের জন্যে রঙ ধরে যায়। কাজে মন বসে না, পথ চলার গতিতে আসে শৈথিল্য। ফাইল ঠেলে দিয়ে জানালা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে অজস্র আলোর আলোড়ন আর অপরাধী মনে করে নিজেকে। এই দিনগুলিকে

নিরলস মুহূর্ত দিয়ে আঁজলা ভরে তুলে নেবে বলেই তো সারা বছর ধরে হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে সে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করে গেছে। সব ভুলে সব কাজ ফেলে একান্ত আপনার জনকে নিয়ে তাকে যেতেই হবে সেখানে যেখানে এ-আলোর এক কণাও হারিয়ে যাবে না অমনোযোগের অবসরে।

সেই বুঝেই যেন ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় গভর্ণমেণ্ট। ওয়াটারলু স্টেশনে ভিড়, ভিক্টোরিয়ায় জায়গা নেই, ইউস্টন—কিংস-ক্রশে স্বভাবগম্ভীর ইংরেজের কী কোলাহল জাগে!

যে যেখানেই যাক—সমুদ্র যেন ডাকে বেশির ভাগ যাত্রীকে। যাদের অর্থ পরিমিত তারা যায় ব্রাইটন, বোর্ণমথ, ডার্টমথ কিংবা হোভ—যাদের অবস্থা ভালো তারা গেলো আইল অব ওয়াইট কিংবা কর্ন ওয়াল, আর যারা বড়লোক তারা ইংল্যাণ্ডে যদি বাড়ি হয় তাহলে এ সময় তাকে নিজের সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই হবে দিশেহারানো আলোর উৎসবে।

সমুদ্রের ধারে—তীরের কোল ঘেঁষে অভিনন্দন জানায় কত অজস্র ছোট বড় হোটেল। দেখলে মনে হয় গ্রীষ্মের অতিথি আসবে বলে যেন তারা এইমাত্র সাজ শেষ করে প্রস্তুত হয়েছে আপনাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নেবার জন্যে। কিন্তু হায়, কতবার যে ঠকেছি! অনাহুতের মতো যখনই সেখানে গেছি এই কথারই পুনরাবৃত্তি।

—কি নাম তোমার?

—অমুক—

—টেলিগ্রাম পাঠাও নি তো তুমি—দুঃখিত, জায়গা নেই।

এত হোটেল—জায়গার অভাব কেন হবে আমার। ব্যর্থ আশা আবার সেই এক কথা। গায়ে পড়ে হোটেলওয়ালী উপদেশ দিয়ে দিলো। এ সময় আমরা বড় ব্যস্ত—আগে থেকে রিজার্ভ করা না থাকলে ঘর দেয়া সম্ভব নয়। পরের বছর তাই করো।

ঘরে কতক্ষণই বা এসময় থাকে লোকে! সারা দিন তো পড়ে থাকে

সমুদ্রতীরে,—তবু ঘরের প্রয়োজন। হোটেলওয়ালীর কথা শুনে অকারণে কেন হাসি পেল আমার। আজকের এই ব্যস্ততা—ঘর দেয়ার এই অক্ষমতা কোথায় ছিল দুদিন আগে। সুধায় ভরা এই কটি মাস তুলে দিয়ে যায় তাদের সারা বছরের খরচ। তারপর একে একে নিভিবে দেউটি। দেখতে দেখতে কখন কোথা দিয়ে কেটে যাবে মধুমাস—অতিথিরা বিদায় নিয়ে ফিরে যাবে। তখন আর হোটেলের ঘরে ঘরে এমন করে আলো জ্বালবে না কেউ। গালে হাত দিয়ে বসে বসে আগামী বছরের জন্যে শুধু প্রহর গুনবে হোটেলওয়ালা। শুকনো মুখে একদিন ছুটি দিতে হবে মেড়কে। প্রতি বছরের মত এবারেও যাবার বেলায় মেড ম্লান হেসে বলে যাবে, আমাকে মনে রেখো—আগামী বছর আবার ফিরে আসব কিন্তু—

আগামী বছর! সে যে অনেক দূর। তবু সেই উজ্জ্বল দিনের কথা কল্পনা করে সজীব চোখে হোটেলওয়ালাকে হাতে হাত মিলিয়ে বলতেই হবে, তোমাকে নিশ্চয়ই মনে রাখবো—তোমার মতো কাজের মেয়ে আমি পাবো কোথায় প্লেডিস।

তাই আমাদের সকলের যখন ছুটি তখন সমুদ্রতীরের হোটেলের যারা মালিক তাদের কাজের শেষ নেই। রঙওয়ালা ডেকে রাঙিয়ে নিতে হয় দরজা-জানালা—লক্ষ্য রাখতে হয় প্রত্যেক ঘরের কার্পেটের দিকে, হিসেবের নতুন খাতা কিনে দাগ টেনে টেনে ঘর ভাগ করে নিতে হয় নিজেকেই। সকাল থেকে রাত্তির অবধি ছুটোছুটি—গ্যাস উনুন বাথরুম রান্নাঘর খাবারের মেনু লেপতোষক বিছানা-বালিশ কত কি। যারা বড় হোটেলের মালিক তারা আবার শুধু এটুকু করেই থামে না—সমুদ্রের ওপর যখন অন্ধকার নামে, বাতাস ভারী হয়ে উঠে, তখন হোটেলে ফিরে আসে স্নান আর রৌদ্র-বিলাসীর দল—তাদের কথা মনে করে হোটেলওয়ালা বাইরে তৈরি করে কাঠের বিরাট নাচের জায়গা। সমুদ্র গর্জনের তালে তালে অনেক রাত অবধি নাচের বাজনা বেজে যায়, আর পায়ে পায়ে ঘেঁষে অক্লান্ত ছন্দে চলে কত নর-নারীর আনন্দ-বিনিময়।

সুইমিং-কস্ট্যুম পরে সমুদ্র-তীরে আবাল-বৃদ্ধ ইউরোপীয়ের মত অসঙ্কোচে গড়িয়ে পড়তে আমার অনেকবার বেধে গিয়েছিল। কালো রঙ যে এদের মধ্যে বড় বেশী বেমানান—অযথা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি লাভ হবে। তাই প্যান্ট কোট পরেই ঘুরে বেড়িয়েছিলাম অনেক দিন। কিন্তু এ হলো উল্টো। ওই করতাম বলেই সকলের কৌতূহলী চোখ পড়ল আমার দিকে। ভাবটা, লোকটা কে—পাগল নাকি—না হলে এই পোশাক পরে এমন আলো আর ঢেউ বিফলে যেতে দেয়। ব্যস, সে কথা যেই বোঝা—আমিও ভিড়লাম তাদের দলে।

সামনে সমুদ্র—একের পর এক ঢেউ ভাঙছে। অগাধ আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। আমার চারপাশে অজস্র নরনারী। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে করছে রৌদ্র-স্নান, আর কেউ এর মধ্যেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—উঠে এসে ভিজে কস্ট্যুমে আবার রোদ্দুরে গড়াবে সারা দিন। তাই বলছিলাম, ঘরে আর এখানে লোকে থাকে কতক্ষণ। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাঁতারের পোশাকে বেরিয়ে পড়ল, লাঞ্চ—মানে স্যাণ্ডউইচ কয়েকটি—সঙ্গে করেই নিয়ে এলো সমুদ্রের তীরে, সেখানেই খাওয়া সেরে নেবে এক সময়। তাছাড়া টুকটাক এটাওটা খাওয়া আর বাচ্চাদের বায়নায় এটাওটা কেনা তো আছেই।

অতগুলি হোটেল থাকলেও সুযোগ বুঝে এপাশে-ওপাশে আরও কত রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে, কত খেলনার দোকান—রঙবেরঙের সুইমিং কস্ট্যুম নিয়ে নানাভাবে চেঁচিয়ে খদ্দের যোগাড়ের চেষ্টা করছে বুড়ো-বুড়ি। এদিকে সেই খোলা আকাশের নীচে কড়া চাপিয়ে সসেজ ভাজছে একজন আর খুব তাড়াতাড়ি নিপুণ হাতে তার মেয়ে ভাজা সসেজ রুটিতে পুরে হাঁকছে সিক্স্‌পেন্স —সসেজ রোল। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ তাই কিনছে লোক। পটেটো-ক্রিশপ—আইসক্রীম—হে—চক—আইস—স্যুভেনির—স্যু ভেনির। পাথরের পেপারওয়েট কিংবা লকেট কি অন্য কিছু সামনে সাজিয়ে বসে যুবতী মেয়ে শুধু বলছে, এখানকার স্মরণ-চিহ্ন না নিয়ে যাবে কেমন করে—এই নাও এসো

আমার কাছে—দেখো কি সুন্দর বাটি। আর এই কোলাহল ছাপিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে অবিশ্রান্ত সমুদ্র গর্জন।

মুনিয়া নেই। সমুদ্র কাউকে হরণ করতে চাইলে তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে বাঁচাবার জন্যে হলদে কস্ট্যুম পরে যারা সব সময় ঘুরে বেড়ায় তাদের বলা হয়, লাইফ-গার্ল। আহা, এদের দেখে কত যুবকের যে ডোববার সাধ হয় তার ঠিক নেই।

উঠে যাবার নাম করে না কেউ—স্নানের পর বালির উপরে সেই যে শুয়ে পড়ে—আর ওঠে সূর্য অস্ত যাবার পর। ঘরে ফেরবার তাড়া নেই—ডিনার তো দেবে সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। এখনও অনেক সময় আছে, এ সময়টুকু কি করা যায়। যাওয়া যাক আস্তে আস্তে যেখানে মেলা বসেছে সেখানে। এর মধ্যেই ভিড় জমে গেছে। মেরী-গো-রাউণ্ড ছোট ছোট ইলেকট্রিক মোটর দ্রুত বেগে চালিয়ে ঘেরা-জায়গায় ঘোরা—কিংবা বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে পুরস্কার পাওয়া কিংবা দোলনা-চেয়ারে বসে বোঁ বোঁ করে ঘুরে যাওয়া—সামান্য পয়সায় শিশুসুলভ আনন্দে কত পরিণত মানুষের মন ভরে যায়। তার ওপর আরও কত রকম ছেলেমানুষী জুয়োর বন্দোবস্ত আছে তার ঠিক নেই।

ওদিকে জলের উপর অন্ধকার নেমেছে আর যেন সমুদ্রের মধ্যে থেকে ওঠা মিনারের মতো উদ্ধত দীর্ঘ 'পায়ারে' জলে উঠেছে সহস্র আলো—তারই ছায়া বুকে নিয়ে নেচে নেচে ফিরছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। দিনের আলোয় এ 'পায়ারে'র এত সৌন্দর্যের কথা কল্পনাও করতে পারি নি। লোকে ছুটে আসে এদিকে। আর 'পায়ারে'র পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁয় স্নানের পোশাকে অনেকক্ষণ ধরে কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে বসে থাকে।

কোনো কোনো জায়গায় রোদ্দুরের জ্বালায় বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি নি—হলদে বেলাভূমি ধরে মন্থর পায়ে অনেক দূর চলে গেছি—দেখেছি অনেক বড় বড় ঢিপি—গুহায় ছোট ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলে। এইসব গুহায় নাকি লোভী নাবিকেরা শুল্ক বাঁচিয়ে নানা মূল্যবান সব জিনিস লুকিয়ে রাখতো। আজ আর সেকথা কেউ মনেও রাখে না। কিন্তু তেমন করে

ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি নি। তথ্য জানবার চেষ্টা করে অপচয় করবার মত অবসরও ছিল না। কবে পুড়ে গিয়েছিল ব্রাইটনের 'পায়ার' আর নতুন করে আবার নির্মাণের খরচ সম্পূর্ণ একা বহন করেছিলেন কোন লর্ড; সমুদ্রতীরে সর্বক্ষণ ব্যস্ত কর্মপ্রিয় ইংরেজের আশ্চর্য অলসতা দেখে এত মন ভরে উঠেছিলো যে সে-খবর সংগ্রহ করবার আগ্রহই ছিল না আমার। অন্য কোথাও বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি শুধু দুধের দোকান কিংবা জেলের ছোট ছোট কুটির —কথা বলে বুঝেছি অতিথি মাত্রেই তাদের কাছে বিদেশী, তা সে ইংরজই হোক আর ভারতীয়ই হোক। অতিথির সঙ্গে তারা কম কথা বলে। সব সময় ভয়, কি বলতে পাছে কি বলে ফেলে।

কত কথা যে জানবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাষার প্রাচীর ভাঙতে পারি নি বলে এর বেশি আর কিছুই জানা হলো না।

সমুদ্রতীরের এক দম্পতির টুকরো টুকরো কয়েকটি কথাই শুধু স্পষ্ট মনে আছে

—কিন্তু—

—বলো ডার্লিং।

—না, এ তো ভালোই হলো।

—কি ভালো হলো?

—এমনি করে আমাদের বিয়ে করা?

—নিশ্চয়ই ভালো হলো—খুব ভালো হলো—

—কিন্তু মা-বাবা তো হ্যারীকে ডিভোর্স করেছি বলে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

—তাদের কথা বাদ দাও—আমরা ভালো বুঝেছি বলেই তো একাজ করেছি, আর শেষের দিকে হ্যারীর সঙ্গে ঘর করা তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল না কি?

—তা তো ঠিক।

—তবে সারাজীবন ধরে শুধু অভিনয় করে কি ফল পেতে তুমি?

—তবু—

—কি?

—কি জানি, ডিভোর্স করা মেয়েদের সম্পর্কে তো সকলের ধারণা ভালো নয়।

—তাতে কি হলো আমাদের?

—সেদিন তো মা স্পষ্ট বললেন, হ্যারীর কোন দোষ নেই, সব দোষ তোর, এমন করে যে-মেয়েরা ঘর ভাঙে তারা নিজেরাও দুঃখ পায়, পরকেও দুঃখ দেয়—

—তুমি আজও হ্যারীকে ভালোবাসো পেগী। হাতের কাছে পেয়ে ঝোঁকের মাথায় আমাকে তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি—

—বাজে কথা বলো না। এ-কি, এই, তুমি রেগে গেলে নাকি?

—আঃ, ছেড়ে দাও আমাকে—

মুহূর্তকালের জন্যে দিশা হারাই। শুধু ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ-এর পর ঢেউ—জীবনের কত ঢেউ!

আধুনিক বাংলা সাহিত্য
✽ ✽ ✽ ও নোবেল পুরস্কার ✽ ✽ ✽

বাংলার অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রায়ই বিলেতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের বাসনা শুধু দেশ ভ্রমণ কিংবা হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁদের আদর্শ ব্যাপক।

আমার শ্রদ্ধেয় সেই সব যশস্বী সাহিত্যিকের কথা শুনে সহজেই বুঝে নিতে পারি যে, তাঁরা এদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শক্তিশালী লেখক বলে পরিচিত হতে চান।

কোনো বাঙালী লেখক যখন সম্পূর্ণ নিজের সাহিত্য-প্রতিভার দ্বারা উপার্জিত অর্থে সুদূর সিন্ধুপারে যাবার কল্পনাও করেন তখন কি জানি কেন, আমার সমস্ত দেহে অকারণে আনন্দের শিহরণ জাগে।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাঙালী লেখক নাকি গরিব। দুঃস্থ সাহিত্যিকের 'মেসে' একটানা ক্লান্তিকর নীরস দিন কাটানোর মর্মান্তিক ইতিহাস আর কে না জানে! আজও পাঠক-সাধারণ মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেন না যে, বাংলাদেশে লোকে লেখে কেন। কারণ তা করা মানে শুধু সময় নষ্ট করা, পয়সাকড়ি তো কিছুই পাওয়া যায় না। যেন অন্য কিছু করলে খুব সহজে পয়সা পাওয়া যায়।

এসব কথা শুনে আমার মনে হয় শুধু সাহিত্যিক কেন আবহমান কাল থেকে এই দুঃস্থ দুর্নামের ভাগী হয়ে আসছে? বস্তুতঃ, এ সংসারে অক্ষম লোক মাত্রেই গরিব। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের বেলা লোকে সমগ্র কুলের ওপর 'দরিদ্র' দুর্নাম দেয় না। এক অক্ষম ডাক্তার যদি সারা মাসে কুড়ি টাকা রোজগার করে তাহলে কেউ বলবে না, ডাক্তারী করে কি হয়, পয়সাকড়ি তো কিছুই পাওয়া যায় না।

কিন্তু বাইরের লোকের কথা না হয় না-ই ধরলাম! বাংলার অক্ষম লেখকরা সুযোগ পেলেই যেখানে সেখানে বলে বেড়ান, কেন যে ছেলেবেলা থেকে সাহিত্য করে সময় নষ্ট করলাম, এখন টাকার ভাবনায় ঘুম হয় না।

এমন কি, তাঁরা আরও বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই পোড়া দেশে জন্মেছি তাই লোকে কদর বুঝলো না। বিলেত-টিলেতে শুনি লেখকেরা নাকি গাড়ি-ঘোড়া হাঁকায়।

তাঁদের মুখ থেকে এমন কথা আমি যখন শুনতাম তখন আমার বলতে ইচ্ছে করতো, আপনারা, মানে আপনাদের মতো লোক যাঁরা কেউই লেখক নন অথচ নিজেদের সাহিত্যিক বলে প্রচার করেন, তাঁরা পৃথিবীর যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সেই একই অবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হতেন। শুধু শুধু বাংলাদেশের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করে আর কি হবে। কিন্তু এত কথা মনে মনে ভাবলেও মুখে বলতে বেধে যেতো। গায়ে পড়ে কে আর মানুষকে আঘাত করতে চায়।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এমন অক্ষম লেখকের সংখ্যা বাংলাদেশে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। তাদের আকাঙ্খা বেশি কিন্তু সামর্থ্য কম। ক্ষমতা নেই বললেই চলে। দৈবদুর্বিপাকে এঁরা লেখক বলে জন-সাধারণের কাছে নিজেদের পরিচয় দেন এবং সর্বত্র বলে বেড়ান যে, বাংলা-দেশের লেখকরা অতি দরিদ্র ইত্যাদি। একথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পাঁচমুখে সম্পাদক ও প্রকাশকদের নিন্দে করে বেড়ান। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক সম্পাদক ধামা ধরা পছন্দ করেন এবং যে লেখকরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সেই ঘৃণ্য কাজ করেন, ভালো ভালো পত্রিকায় তাঁদের অতি বাজে লেখা ঘন ঘন প্রকাশিত হয়। যেন আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সম্পাদকের ধামা ধরলেই রাতারাতি কবি যশোলাভ করা যায়। একটা কথা বলে রাখা সমীচীন যে, এমন কথা যে তথাকথিত লেখকরা বলেন এবং ভাবেন তাঁরা নিজেরা শুধু আত্মসম্মান নয় আরও অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে সম্পাদকের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। তা করেও যখন সেই বিশেষ পত্রিকায় কিছুতেই

জায়গা করতে পারেন নি তখন এসব অবান্তর কথা বলে নিজেরা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছেন।

আর লোককে বোঝান যে, প্রকাশকদের তাঁরা মানুষ বলেই ধরেন না। বাংলার প্রকাশক মাত্রেই ইতর, অসাধু, স্বার্থপর এবং অভদ্র। তারা এক হাজার বলে লেখকদের বই দু তিন হাজার ছাপায়, পাওনা পয়সা কিছুতেই দিতে চায় না—বাংলাদেশের প্রকাশকরা এমনি প্রবঞ্চক বলে বাঙালী লেখকের আর্থিক অবস্থা চিরকাল খারাপ থেকে যাচ্ছে—এইসব আরও অনেক রকম কথা।

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে যারা কৃতকার্য হতে পারলো না তাদের তুলনায় নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক সব চেয়ে দরিদ্র। কিন্তু একথা ভাববার সময় আমরা আর একটি বড়ো কথা ভুলে যাই যে, জীবনে কৃতকার্য কিংবা অকৃতকার্য, সাহিত্যিক যাই হোন না কেন তিনি পরিমাণ বিশেষে এমন আশাতিরিক্ত কিছু লাভ করেন, যার নাম দিই, যশ।

তবু জানি শুধু যশে পেট ভরে না। আর পেট ভরে না বলেই, একজন লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা ছোট কাজ করে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। একজন দুঃস্থ ডাক্তার হয়তো তা কোনোদিনও করেন না। আমরা সাধারণতঃ শুনি না যে, কোনো এম-বি ডাক্তার পোস্ট আপিসে কেরানীগিরিও করেন, আবার ডাক্তারীও করেন।

তাই আজও আর পাঁচজন ধরে নেন যে, যত বড় লেখক হোন না কেন তাঁকে লেখা ছাড়া অন্য কিছু করতেই হবে, তা না হলে তাঁর কিছুতেই দিন চলবে না।

স্বীকার করা সঙ্গত, কথাটা একাংশে সত্যি বৈকি। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি আর সাহিত্যিক—এদের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ। সাহিত্যিকদের জন্য এমন কোন স্কুল কলেজের ব্যবস্থা নেই, যেখান থেকে পাস করে বেরোলে—সাহিত্য করার অধিকার পাওয়া যায়। তাই হঠাৎ একদিন যে কোনো লোক নিজেকে লেখক বলে ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু ডাক্তারী করার সময় তা করা সম্ভব নয়।

একটিতে বিদ্যা দরকার, অন্যটিতে বিদ্যা না হলেও চলে। তাই দুই বিভাগের নিয়মকানুন আলাদা হলেও শক্তিশালী লেখকরা কেউ কেউ বিদ্যার পরিচয়ও দিয়ে থাকেন।

আগে কবিরা ছিলেন অন্য জগতের মানুষ। জীবনের সঙ্গে কাব্যের যোগ না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না, অনেকে মনে করতেন সাহিত্য কল্পনা-বিলাস মাত্র। বলা বাহুল্য, এখনও অনেকে সে কথা মনে করেন। তবু আজ সাহিত্যে নানা পরিবর্তন হয়েছে এবং কবি হলেই যে ঝাঁকড়া চুল রেখে মুখের ভাব উদাস করে চলে ফিরে বেড়াতে হবে তাও কেউ ধরে নেয় না।

তারপর আসে অর্থ উপার্জনের কথা। আমরা অনেকেই জানি, যে লেখক সামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমানে তাঁর অর্থের অভাব নেই। তবু তিনি অন্য কিছু করেন কারণ সব সময় লেখা তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, নিজের মেজাজ বুঝে তাঁর চলতে হয়। অতীতে সাহিত্যিকরা অর্থকষ্টে দিন কাটাতেন কারণ তখন মনের শিক্ষার দিকে মানুষের এত বেশি ঝোঁক ছিলো না, আজকের মতো জীবনে বইয়ের প্রয়োজন ছিলো না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা যে পূর্বে অর্থকষ্ট পেয়েছেন তার চেয়ে দুঃখের কথা বোধ হয় আর কিছু নেই। শিক্ষার মান যত বাড়বে, লোকে পড়াশুনোর দিকে যত বেশি আকৃষ্ট হবে, বলা বাহুল্য লেখকদের আর্থিক অবস্থা তত বেশি ভালো হবে।

কিন্তু আশ্চর্য, আজও অনেকের বিশ্বাস যে, যত বড় সাহিত্যিক হোন না কেন, অর্থকষ্টের হাত থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পেতে পারেন না। যখন এসব কথা শুনি তখন আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, শুধু সাহিত্যিক কেন, অর্থকষ্টের হাত থেকে কে মুক্তি পেতে পারে?

তারপর নানা কথা ওঠে, মাইকেল, নজরুল—এই সব শক্তিশালী কবিদের নাম উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, অত বড়ো কবির যখন অমন অবস্থা হয় তখন আপনারা তো কোন্ ছার!

অবশ্য সেই সব অল্পবুদ্ধি পাঠকের কথায় কিছু মনে না করাই উচিত।

তবু তাঁদের কথা শুনে আমার বলতে ইচ্ছে করে, আপনারা যাঁদের নাম করলেন, সেই সব লেখক যদি মাসে লক্ষ টাকা উপার্জন করতেন তাহলেও তাঁদের সেই একই অবস্থা হতো। কবি ছাড়া মাইকেল অন্য কিছুও যে ছিলেন, দারিদ্র্যের কথা উঠলে আশ্চর্যভাবে লোকে শুধু সেই কথাটাই ভুলে যান। দুঃস্থ দুর্নাম, যেন কেবলমাত্র বাঙালী সাহিত্যিকদের জন্যেই।

হয়তো এত কথা বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত আসরে অবান্তর। আমার বলবার আসল কথা হলো যে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে যে কোনো ক্ষেত্রের যে কোনো মানুষ কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সাহিত্যিক ছাড়া অন্য কারুর বেলায় আমরা বলি না, ব্যারিস্টাররা বড় গরীব, শ্বশুরের পয়সায় পোশাক কেনে কিংবা ডাক্তাররা দাদার টাকায় ডিস্‌পেন্সরী খোলে, অথচ ঠিক খবর রাখি কোন্ লেখক কমাসের বাড়ি ভাড়া দিতে পারে নি কিংবা এক মাসে কত টাকা কার কাছ থেকে ধার করেছে।

এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার। সাহিত্যিকদের জীবনযাত্রার ধরন একটু আলাদা। থোকে মোটা টাকা পেলেও সহসা তাঁরা নাইট ক্লাবে গিয়ে সেকথা জাহির করেন না কিংবা ঘন ঘন বাইরে লাঞ্চ ডিনার খেয়ে আর পাঁচজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন না যে, তাঁর বর্তমান মাসিক আয় প্রায় প্রবীণ সিভিলিয়ানের উপার্জনের কাছাকাছি।

তা ছাড়া, সাধারণতঃ একজন লেখকের মন অত্যন্ত কোমল এবং তিনি হাজার চেষ্টা করলেও অতিমাত্রায় সংসারী হতে পারেন না। ফলে প্রকাশক মহলে তাঁর বিচক্ষণ পাওনা আদায়কারী বলে নাম থাকলেও আসলে তিনি শিশুর মতো সরল। এক হাতে তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা আদায় করেন অন্য হাতে দান করেন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের জন্য ব্যয় করেন। আমার পরিচিত অনেক বাঙালী লেখক যাঁরা মাসে অন্তত হাজার টাকা রোজগার করেন, যতদূর জানি তাঁরা নিজের জন্য প্রায় কিছুই খরচ করেন না। তেমন একটা লোভ করবার মতো সংখ্যা তাঁরা ব্যাঙ্কে রাখতে পারেন নি, এমন কিছু সম্পত্তির ব্যবস্থাও করতে পারেন নি যা লোককে বলা যায়। অথচ

শুনি যে, তাঁর বছরে চারটে করে উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি পাঠক মহলে সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু লেখকের অবস্থা যে-কে-সেই। এমন হিসেব করে একজন লেখকের পক্ষে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমরা যখন একজন লেখকের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের সব সময় একথা মনে রাখা উচিত যে, লেখকের চিরকাল আর্থিক অনটনের জন্যে দায়ী তিনি নিজে, দায়ী তাঁর কোমল স্বভাব আর বেহিসেবী মন। এমন তরুণ মনের জন্যেই কোনো কবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, কেউ মাসে হাজার টাকা রোজগার করলেও প্রকাশককে পঞ্চাশ টাকা আগাম দেবার জন্য তাগিদ দেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁদের অর্থকষ্ট থেকে যায়।

তবু খুবই সুখের কথা সম্প্রতি ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকরা সকল রকম অভাবের হাত থেকে মুক্তি পেতে আরম্ভ করেছেন এবং জীবনে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হলে যে জিনিসগুলির প্রয়োজন সেগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁরা কিনে ফেলছেন। যেমন ধরুন, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি। বাংলাদেশে আরও অনেক লেখক আছেন যাঁরা ইচ্ছে করলে অনায়াসেই আরও অনেক ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন যদি তাঁরা তাঁদের স্বভাবসুলভ সরলতা চেষ্টা করে কিছুটা সংযত করতে পারেন। শোনা যায়, পাঁচভূতে নাকি তাঁদের অর্থ লুটে নেয়।

হয়তো তাতে খুব বেশি দুঃখ করবার নেই। বেহিসেবী যৌবন জীবন-শিল্পীকে যদি জীবনের শেষ অবধি মাতাল করে রাখে তাহলে ক্ষতি কি। লোকে তাঁর যতই নিন্দে করুক না কেন, তিনি তো নিজেকে বঞ্চিত করেন নি পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ, রস, গন্ধ থেকে। সে অনুভূতির তীব্র তোড়ের কাছে সামান্য অর্থকষ্ট কিছু নয়।

সে কথা জানি। সে কথা হৃদয় দিয়ে মানি। তবু সংসারে থেকে দৈনন্দিন দাবি অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে লেখকরা এতদিন তা করে গেছেন, তাঁদের সাধারণ মানুষ কৃপা করেছে আর তাঁরা নিজেরা শুধু শুধু অকারণে কষ্ট পেয়েছেন।

এখন আস্তে আস্তে সকল কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। পার্থিব যা কিছু, দিনে দিনে দেখছি সবার উপরে আসন নিচ্ছে। লেখকরা দেশের কথা ভেবে, দশের কথা মনে করে সচেতন হয়ে উঠেছেন। গজদন্ত মিনারে বসবাস করবার দিন নতুন হাওয়ায় শেষ হয়ে এলো। যে আত্মসচেতন হিসেবী শক্তিশালী লেখকরা পৃথিবীর মঙ্গল চান, তাঁরা আমাদের নমস্য। আমি তাঁদের কথা দিয়েই একেবারে প্রথমে আরম্ভ করেছিলাম। এখন আবার তাঁদের আলোচনায় ফিরে যাই।

এই বাংলার ধনী লেখকরা আজ বিলেত যেতে চান। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেখানে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্তমানে এদেশের পক্ষে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু নেই। লক্ষ লোক তো প্রতিদিন বিলেত যাচ্ছে। কত ছাত্র, কত বড়লোক, কত সরকারী কর্মচারী, কত স্তরের কত ধরনের লোক। অথচ আশ্চর্য, যাঁরা সংস্কৃতি বিনিময়ের অগ্রদূত শুধু তাঁরা নিজেদের পরিধি সঙ্কীর্ণ করে রাখলেন। কেউ কেউ সংসার আত্মীয় পরিজনের দোহাই দিলেন, কেউ কেউ আরও নানা অজুহাতে বিলেত যাওয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। আর যাঁরা অনেক অর্থকষ্ট ভোগ করে হঠাৎ অতি মাত্রায় সঞ্চয়ী হয়ে গেছেন, তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলেত গিয়ে কি হবে?

যাঁরা একথা বলেন, যাঁরা ইচ্ছে প্রকাশ করে শেষ অবধি চুপ করে যান, যাঁরা ভয়াবহ খরচের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার কথা ভাবতে সাহস পান না, আমি সবিনয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এই মুহূর্তে তাঁদের জানাবো। আমি বুকভরা আগ্রহে বলবো যে, সমগ্র ইউরোপ তাঁদের জন্যে বরণের মালা হাতে নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। যদি তাঁরা আজ সত্যি বিদেশে পাড়ি দেন তাহলে সেখানে গিয়ে সহসা একদিন উপলব্ধি করবেন, কী বিপুল যশ তাঁদের জন্যে তোলা রয়েছে।

বস্তুতঃ ইউরোপে মাত্র দু একজন অতি সাধারণ বাঙালী লেখকের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম পরিচিত নয়। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ বাংলায় যত শক্তিশালী লেখক আছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তত নেই।

শ্রদ্ধাস্পদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। আমরা একথা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি যে, ইচ্ছে করলে কিছুদিন বিলেত বাস করে আসা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর তুলনায় অনেক শক্তিহীন লেখক শুধু ইউরোপে জন্মগ্রহণ করে অন্য ভাষায় লিখেছেন বলে আজ পৃথিবী জোড়া যশের অধিকারী হয়েছেন। এমন কি, তাঁরা নোবেল পুরস্কার অবধি লাভ করেছেন। তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। কিন্তু আমার বলবার কথা হলো যে, তাঁদের চেয়েও অনেক প্রতিভাবান লেখক বাংলাদেশে আছেন। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা একেবারে পরিষ্কার করে নেয়া যাক। ফিনল্যাণ্ডের লেখক স্যালিন্‌পা (Salinpaa) তাঁর "Meek Heritage" উপন্যাসের জন্যে এককালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সহৃদয় পাঠক যদি দয়া করে সে উপন্যাসখানি পড়ে দেখেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরাও মনে মনে ভাববার চেষ্টা করবেন, যদি "Meek Heritage"-এর জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় তাহলে কেন সে পুরস্কার "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" কিংবা "নাগিনী কন্যার কাহিনী"র জন্যে দেয়া হবে না ?

এমন আরও অনেক উদাহরণ দেয়া চলে। আজও অনেক বাঙালী পাঠক আছেন যাঁরা বিনা দ্বিধায় বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেন, আমি বাংলা পড়ি না, কণ্টিনেণ্টাল লিটারেচার পড়ে বড়ো আনন্দ পাই।

আমি জোর করে বলতে পারি যে, যদি তাঁদের বলা হয়, প্রমাণ করুন, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের চেয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশের আধুনিক সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ, আমি জানি, যদি সত্যি তাঁরা কণ্টিনেণ্টাল লিটারেচার পড়ে থাকেন তাহলে চুপ করে থাকবেন।

অথচ আমরাই বিদেশী লেখকদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করি। কেউ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন শুনলে তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য যোগাড় করে কাগজে কাগজে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সেটা নিঃসন্দেহে খুব বড়ো কাজ। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে। কিন্তু যখন আমরা

কোনো বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করি কিংবা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনো লেখকের নানা তথ্য জানবার প্রাণপণ চেষ্টায় গলদঘর্ম হই, তখন কেন ক্ষণ-কালের জন্যেও আমাদের মনে হয় না, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন? ফ্রাঁসোয়া মেরিয়াকের "থেরেস" পড়বার সময় সাধারণবুদ্ধি পাঠকের মনে হওয়া যে স্বাভাবিক "পুতুল নাচের ইতিকথা" আরও ভালো উপন্যাস। পৃথিবীর অতি আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক সে উপন্যাস সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে নীরব।

মার্কিন লেখকরা বর্তমানে লিপিচাতুর্য দেখাচ্ছেন সেকথা চাক ঢোল পিটিয়ে আমরাই দিনের পর দিন জাহির করি। কিন্তু কেন আমরা একবারও সাহস করে বলবার চেষ্টা করি না যে, উইলিয়ম ফক্‌নারের মতো প্রতিভাবান লেখক এই বাংলা দেশেও থাকতে পারেন।

আমাদের দেশের কোনো লেখকের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লেখকের তুলনা করে আর কারুর নাম করে সুধীবৃন্দের অপ্রিয় হবো না। শুধু বলবো, সময় এসেছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। বাঙালী লেখকদের ভারতবর্ষের কথা মনে করে এবার পৃথিবীর লেখকদের পাশে প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আত্মশ্লাঘা মুর্খের কাজ কিন্তু আত্মবিশ্বাস না থাকলে নিজেকে কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আমার শ্রদ্ধেয় অনেক বাঙালী লেখকের শক্তি আছে, অর্থ আছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আত্মবিশ্বাস নেই। তা যদি থাকতো তাহলে এর মধ্যেই তাঁদের অনেকে বিশ্ববিজয় করে নিতে পারতেন।

আরও ব্যাপকভাবে এবার সেকথা বলি। বাংলা দেশের লেখকদের খ্যাতি সাধারণতঃ শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা মাঝে মাঝে অনুবাদে উৎসাহ দেখান বটে এবং হিন্দি গুজরাটি ভাষায় তাঁদের দু একটি উপন্যাসও অনুবাদ করা হয়। কিন্তু প্রতিভার তুলনায় তাঁদের যা খ্যাতি হওয়া উচিত, তা হয় না। হয় অনুবাদ খারাপ হয়, নয় প্রকাশক ভালো হয় না। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে তাঁদের চিন্তাধারা অন্যান্য প্রদেশের লোকের কাছে পৌছয়

বটে কিন্তু চিত্র পরিচালকেরা তাদের নিজেদের চিন্তাধারার পরিচয় এত বেশি দেবার চেষ্টা করে যে, লেখকের কাহিনী শেষ অবধি কতটা থাকে বোঝা কঠিন। আমাদের দেশের লেখকরা মাদ্রাজ গুজরাটের কথা কিছু কিছু ভাবলেও বিলেতের কথা তেমন করে ভাবেন না। ছেলেবেলা থেকে, 'সাহিত্য করে কি হবে?' 'যাদের কিছু হয় না তারা লেখক হয়'—এই ধরনের নানা কথা শুনতে তাঁরা বর্তমানে এমনই অভ্যস্ত যে, তাঁদের পক্ষে কি করে পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা পেতে হয় সেকথা ভাবা কঠিন।

অথচ আমি আজ দৃঢ়স্বরে কয়েকজন বাঙালী লেখকের কয়েকটি উপন্যাসের নাম করে বলবো যে, যদি সেগুলির সামান্য ভালো অনুবাদ প্রকাশ করা যায় তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে সাড়া জাগবে এবং নোবেল কমিটির তালিকায় তাঁদের নাম ওঠা বিচিত্র নয়। 'নোবেল প্রাইজ' কথাটি শুনলে বাঙালী লেখকরা মুচকি হেসে চুপ করে থাকেন—যেন তাঁদের কাছে সে পুরস্কার হলো সুদূরের চাঁদ। অথচ ইউরোপের যাঁরা সে পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কি সত্যি প্রতিভাবান?

এক কথায় উত্তর দেয়া চলে, না—তাঁরা নন। কিন্তু তাঁদের তদারকের জোর আছে। নানা ভাবে নরওয়ে সুইডেন গিয়ে নোবেল কমিটির কাছে তাঁদের প্রমাণ করতে হয় যে, দেশে লেখক বলে তাঁদের বিলক্ষণ খ্যাতি আছে।

নোবেল পুরস্কার হলো, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ব্যাপার। তাই প্রাইজের তালিকা খুললেই দেখা যায় যে, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের বহু লেখক এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের লেখা এমন কিছু ভালো নয় এবং খুব কম লোক তাঁদের নাম শুনেছেন।

নোবেল পুরস্কার পেলে একজন বাঙালী লেখকের জীবন ধন্য হয়ে যাবে কিন্তু ইংরেজ লেখক তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সাধারণ খবর হিসাবেই ছাপা হয়। ব্যাটরা সাহিত্য সমিতি যদি বছর বছর বাঙালী লেখককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন তাহলে লেখকরা টাকার লোভ করবেন বটে কিন্তু যাঁরা

সে পুরস্কার দিলো তাঁদের বড়ো দরের সমালোচক বলে মনে করবেন না। নোবেল কমিটির ওপর একজন ইংরেজ লেখকের ঠিক সেই ধারণা।

কিন্তু ইংরেজ লেখকের ধারণা যাই হোক বাঙালী লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ ভীরুতার জন্যে নোবেল প্রাইজকে আজও একেবারে নাগালের বাইরে বলে মনে করেন। একথা আজকের যুগে তাঁদের আর ভাবা উচিত নয়।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি নরওয়ের চারজন শিক্ষিত ভদ্রলোক কি কাজের জন্যে যেন লণ্ডনে বেড়াতে আসেন। ঘটনাচক্রে ইণ্ডিয়া হাউসে লাঞ্চের টেবিলে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় এবং একথা সেকথার পর নোবেল প্রাইজের কথাও উঠে পড়ে। তখন অবধি আমার ধারণা ছিলো যে, সে পুরস্কারের আয়-ব্যয় হিসেব-নিকেশ সবই বুঝি সুইডেনে করা হয়। তাঁদের মুখে শুনলাম যে, ট্রাস্টিরা থাকে নরওয়েতে। সবই সেখানে করা হয়, সুইডেনে শুধু প্রাইজ দেয়া হয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের লেখকদের কথা মনে করে এই পুরস্কার দেয়ার নিয়মাবলী বিস্তৃতভাবে জানবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং প্রাণপণে সে প্রসঙ্গ তোলবার সুযোগ খুঁজছিলাম।

কিন্তু যা শুনলাম তাতে আমার আশা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্যে ভারতবর্ষের লেখক সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ অত্যন্ত বেশি এবং কোনো ভারতীয় লেখককে এই পুরস্কার দিতে পারলে তাঁরা সব চেয়ে বেশি খুশি হবেন। কিন্তু দুঃখের কথা, নির্বাচনের জন্যে ভারতীয় লেখকের লেখা তাঁরা মোটেই পান না। যাঁদের রচনা পান তা খুব উল্লেখ-যোগ্য নয়। আর সেই সব লেখকরা মাদ্রাজ ও বম্বের লোক, আধুনিক বাঙালী লেখকের কোনো লেখাই নোবেল কমিটিতে আজ অবধি পৌঁছয় নি।

এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি থাকতে পারে। সমস্ত জেনে শুনে যদি বাঙালী লেখকেরা জন্মগত আলস্য আর স্বভাবসুলভ ভীরুতার জন্যে নিজেদের পরিধি সংকীর্ণ করে গা বাড়িয়ে সাধারণের কাছে অবজ্ঞা লাভ করে দীনের

মতো দিন কাটিয়ে তিলে তিলে শেষ হয়ে যান তাহলে সে লজ্জা শুধু তাঁদের কিংবা আমার একার নয়, সে কলঙ্ক সমগ্র ভারতবর্ষের।

আমরা সকলেই জানি রচনায় কি কি উপাদান থাকলে একজন লেখক নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন। অন্তত: পৃথিবীর যে সমস্ত লেখকেরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের রচনায় আর কিছু থাক বা না থাক, ব্যাপক মনের ইঙ্গিত আর বিশাল পরিধির সুস্পষ্ট ছবি রয়েছে। প্রতিদিনের সংকীর্ণ স্বার্থ আর তুচ্ছতায় আবিল মন সহসা যদি স্পর্শমণির ছোঁয়ায় সুমেরু শিখর শিরে সূর্যের মতন জ্বলে ওঠে তাহলে পাঠক সহজেই বুঝে নেয় যে, সেই বিশেষ লেখক জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখেছেন এবং তাঁর অন্যান্য রচনায় সব সময় তাই দেখবার চেষ্টা করেন। আমাদের দৈনন্দিন স্বার্থ বঞ্চনা কলহ বিদ্বেষ রাজনৈতিক আন্দোলন ও দারিদ্র্যের দুঃসহ নিপীড়ন—এসবের উর্ধ্বে কি আর কিছু নেই যা আমাদের বাচিয়ে রাখে, যা আমাদের সিসে থেকে সোনা ফলাবার প্রেরণা জাগায়? ভারতের আকাশ যে ত্যাগের মন্ত্রে, ধ্যানের মন্ত্রে, শক্তির প্রেরণায় যুগযুগান্তর থেকে প্রতিধ্বনিত, যার লাগি রাজপুত্র জীর্ণ কন্থা পরে—ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত বাণী যাঁর লেখনী শোনাবার চেষ্টা করবে তাঁরই জন্যে যে সমগ্র পৃথিবীর যশ মান বৈভব—সে কথা নতুন করে বলবার কি প্রয়োজন।

আনন্দের কথা যে তেমন লেখকের অভাব বাঙলা দেশে নেই—কোনোদিন ছিলোও না। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাবে, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বিষাক্ত হাওয়ায় সেই সব লেখকরা চাপা পড়েছিলেন।

তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ করে তুলেছিলো কতকগুলো আহাম্মক স্নব যারা বিলেত থেকে ফিরে স্লিপিং স্যুট পরে রাত কাটাতো আর দিনের বেলা হ্যাভানা চুরুটে টান মেরে বাপের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় ড্রেসিং গাউন পরে ইউরোপের লেখক সম্পর্কে বড়ো বড়ো বিশেষণ বসিয়ে দুর্বোধ্য প্রবন্ধ লিখে বিদ্যে জাহির করতো। তখন তারা যদি বাঙলার শক্তিমান লেখকদের তুচ্ছ না করে দুএকটি ভালো বাংলা উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করতো তাহলে আজ আমরাই বারবার তাঁদের নাম উল্লেখ করতাম।

সুখের বিষয়, আজ সেইসব আহাম্মকদের দিন শেষ হয়ে গেছে। তেমন কোনো লোকের আবির্ভাব হলে পাঠকসাধারণ আগেকার মতো আর মাথা ঘামায় না, বরং বিদ্রূপ করে। তাদের গজদন্তমিনারে পড়েছে সাধারণ মানুষের উন্মত্ত লাথি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তাদের আশ্রয়স্থল। যে ময়দানের পাশে দামী মোটর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে হাওয়া খেতে খেতে গৃহস্থ বাঙালী পাঠককে ধোঁকা লাগাবার জন্য তারা স্পেংলারের বিভীষিকা কিংবা ওই ধরনের আরও বড়ো বড়ো বাজে কথা বোকার মতো ভাবতো আজ উদ্ধত প্রাণের প্রকাশে বিরাট মিছিলের ভয়ে তাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয়—আরও সরতে হবে—একেবারে শেষ হয়ে যেতে হবে। তারা আজ একঘরে, তাদের কথা কেউ শোনে না, তাদের কেউ মানে না।

মাঝে মাঝে শ্রীমনোজ বসু বিলেত যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন কিন্তু ব্যাস্, শেষ অবধি সব জুড়িয়ে যায়, আর কথা হয় না। অথচ যে কোনো মুহূর্তেই ইচ্ছে করলে তিনি বিলেত গিয়ে পৃথিবীর সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস, বিশেষ করে, 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' ও 'জল জঙ্গল'—একটু চেষ্টা করলে বিদেশে আশ্চর্য সমাদর লাভ করতে পারে।

এমন আরও ধনবান শক্তিশালী লেখক বাংলা দেশে বর্তমানে আছেন যাঁদের দ্বারা বিদেশে বাংলা সাহিত্যে জয়গান বেজে উঠতে পারে। তারাশঙ্কর ও মানিকের কথা আগেই বলেছি, এই সূত্রে আরও একজন লেখকের নাম উল্লেখ না করে পারছি না, তিনি হলেন, শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী। দৃঢ়স্বরে বলা যায় যে, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত দীর্ঘ উপন্যাস "অচিন রাগিনী" ভালোভাবে অনুবাদ করতে পারলে তাঁর খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে না হোক, ইংল্যাণ্ড ও নরওয়ে সুইডেনে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে যাবে।

কিন্তু আর দেরি নয়। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এবার লেখকদের সতর্ক হতে হবে। নোবেল পুরস্কারের কথা উঠলেই পরিহাস মনে করে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলে তাঁরা নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারবেন। সংস্কৃতি বিনিময়ের

স্বর্ণক্ষণ এসেছে। যে বাঙালী লেখকদের অর্থ প্রতিভা যশ—সবই আছে তাঁরা কেন এখনও পৃথিবী মন্থন করে নিজেদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করছেন না? মনোজ বসু ছোটোখাটো ভ্রমণ কমিয়ে দিয়ে কেন সাত সমুদ্র পার হতে আজও ইতস্তত: করছেন? একথা তাঁর ভুললে চলবে না যে, তিনি ধনী ব্যক্তি। বিলেতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারলে তিনি শুধু নিজে আশ্চর্য যশ লাভ করবেন না, সমস্ত বাঙালী লেখকের প্রতিনিধি হয়ে প্রমাণ করবেন যে, তাঁরা দুঃস্থ দীন শখের সাহিত্যিক নন, তাঁরা জীবনশিল্পী; সময়মতো পৃথিবী তাঁদেরও একদিন বিজয়মালা দান করবে।

বার বার একথা তুলছি কারণ তদ্বির না করলে কারুরই কিছু হয় না। প্রতিভাবান বাঙালী লেখকদের বিদেশে গিয়ে নির্লজ্জের মতো তদ্বির করতে হবে। প্রথমে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করতে হবে। তারপর তা নিয়ে সর্বপ্রথম যেতে হবে লণ্ডন। সেখানে সটান হাই-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে, এই আমার শ্রেষ্ঠ রচনার অনুবাদ, এগুলি নোবেল কমিটিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।—

হাই-কমিশনার সেগুলি কিছুদিন নিজের কাছে রেখে নেড়ে-চেড়ে দেখবেন তারপর দু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সেই বিশেষ লেখক সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন এবং যথাসময়ে সেগুলি নরওয়ের নোবেল কমিটিতে পাঠিয়ে দেবেন।

লেখকের কাজ কিন্তু শুধু এই করেই শেষ হলো না। তিনি অনুবাদের আরও কপি উপহার দেবেন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ও নাম করা কবি, সাহিত্যিকদের—যেমন টি. এস. এলিয়ট, জুলিয়ান হাক্সলি, কিংসলি মার্টিন ইত্যাদি।

তারপর তাঁকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যেতে হবে এবং ভারত সরকারের প্রতি-নিধির সঙ্গে দেখা করে তাঁর ইচ্ছে স্পষ্ট জানাতে হবে। সেখানেও সন্ধান নিয়ে প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে—যেন মনীষীরা তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। সময় বেশি থাকলে ফ্রান্স, ইটালি ও ইওরোপের অন্যান্য কণ্টিনেণ্টের প্রসিদ্ধ লেখকদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর উপন্যাসের

অনুবাদ দিলে আরও ভালো হয়। কোনো বাংলা উপন্যাস যদি ভালো ইংরেজীতে অনুবাদ করানো যায় এবং ইংল্যাণ্ডে তা সামান্য আলোড়ন আনে তাহলে মস্ত সুবিধা এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় তা খুব সহজেই অনূদিত হয়ে যায়। নোবেল কমিটিতে কোনো বই পাঠাবার আগে লেখক যদি নিজেকে ইওরোপের মনীষী মহলে পরিচিত করেন তাহলে নোবেল পুরস্কারের নির্বাচন তালিকায় আরও তাড়াতাড়ি তাঁর নাম ওঠবার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক লেখক বিলেতে গিয়ে সে দেশের লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু হাতে তা করে লাভ নেই কারণ তাহলে আমাদের লেখককে সেই বিশেষ বিদেশী লেখকের ভক্ত সেজে গিয়ে শুধু তাঁর কৃপা কুড়ুতে হবে। আর হয়তো বাঙালী লেখক সেই বিদেশী লেখকের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। তাই সব সময় অনুবাদ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

অনুবাদ প্রসঙ্গে লেখককে খুব সতর্ক হয়ে বই নির্বাচন করতে হবে কারণ যে লেখা বাংলা দেশে আলোড়ন এনেছে, বিদেশে সে লেখা হয়তো এতটুকু স্বীকৃতি না পেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যপূর্ণ ভ্রমণের জন্যে ঠিক দশ হাজার টাকা খরচ হবে। বাংলা দেশে এমন বহু লেখক আছেন যাঁরা ওই সংখ্যা অনায়াসেই ব্যয় করতে পারেন। তাহলে কেন তাঁরা কূপমণ্ডুকের মতো দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন? বিশ্ববিজয় অভিযানে যদি তিনি দৃঢ়চিত্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েন তাহলে রাতারাতি নোবেল পুরস্কার না পেলেও নির্বাচন তালিকায় তাঁর নাম উঠবেই এবং ইওরোপের মনীষীবৃন্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন, তাঁর পাঠক বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকবে। দেশের কথা মনে করে তাই তো একজন লেখকের সব চেয়ে বড়ো কাজ।

সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্যে আজ বিশ্ব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লেখক হলেন চিন্তাধারা আদান-প্রদানের অগ্রদূত ; তাই আজ শক্তিমান হয়ে নিজের পাওনা সম্পূর্ণ আদায় না করে কেন তিনি অকারণে শুধু শুধু ঠকে মরবেন।

বিলিতি প্রেম

সে বছর শীতকালে তুমি যদি অলিভকে দেখতে তাহলে কিছুতেই চিনতে পারতে না। মেয়ে আমার খায় না দায় না হাসে না নাচে না বাইরে যায় না, শুধু গুম হয়ে বসে থাকে। তুমি যেন আবার ওকে এসব কথা বলতে যেও না; কি ব্যাপার হয়েছিলো জানো? মেয়ে আমার সেই প্রথমবার প্রেমে পড়েছিলো। কিন্তু তিন মাস পর সে-ছেলের অলিভকে আর ভালো লাগলো না। মনের কথা স্পষ্ট করে তাকে জানিয়ে দিয়ে রিচার্ড বিদায় নিলো।

অলিভ আর কি বলবে বলো। সে অবশ্য এমনি করে হঠাৎ রিচার্ডকে হারাবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না! কিন্তু তাকে সেকথা কেমন করে তখন জানাবে। যা ভেঙে গেছে তা জোড়া দেবার চেষ্টা করে নিজের দৈন্য প্রকাশ করা বোকামি। তা করে কিছু লাভও হয় না। যা স্বতঃস্ফূর্ত নয় তা ভঙ্গুর। কিন্তু অলিভের বয়স তখন ঠিক সতের। ওর কি আর এত কথা বোঝবার মত বুদ্ধি ছিলো! সে তো বাড়ি ফিরে কেঁদেই সারা। কী কান্না—কী কান্না! কেবলই আমাকে বলে, বল মা, রিচার্ড ফিরে আসবে কিনা, যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে এনে দাও।

মেয়ের রকম দেখে আমি তো হেসেই বাঁচি না। আরে বাপু, আমরাও তো ওর মত বয়সে কত প্রেম করেছিলাম। কিন্তু কই, ওর মত করুণ অবস্থা তো আমার কখনও হয়নি। জানো বাছা, মেয়ে আমার বড্ড ভালমানুষ। পারো তো ওকে একটু চালাক করে দিও। তোমার কথা ওর মুখে আজকাল প্রায়ই শুনি। কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করি, এখনই আ... এসে পড়বে। ওর রকম দেখে আমি তো মনে মনে হেসে বাঁচি না। কী ছেলেমানুষ মেয়ে আমার! এ ব্যাপার নিয়ে কেউ আবার এত মাথা ঘামায়! কচি বয়স। প্রথম মানুষকে ভালো লেগেছে বলে তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে! আরও পাঁচজনকে দেখ,

তুলনা কর, যাচাই কর, যৌবন উপভোগ কর—তারপর তো বিয়ে। কিন্তু এখন সেকথা মেয়ে আমার শুনলে তো। হাপুস নয়নে অলিভ শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

মেয়ের রকম সকম দেখে অবশেষে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তখন ছাই আবার শীতকাল! জানই তো শীতকালে এ পোড়া দেশের অবস্থা কেমন হয়। দিনরাত শুধু কুঁকড়ে থাক। ফুল নেই, পাখি নেই, মনে আনন্দ নেই, শুধু বরফ আর বরফ—সব কিছু যেন বরফে চাপা পড়ে যায়। আর ভাঙবি তো ভাঙ, অলিভের বুক ভাঙল সেই হাড় কাঁপানো শীতে! মরণ আর কি! মেয়ে আমার দিনরাত গোঙায় আর আমি ভাবি কবে যে হায় বসন্ত আসবে, ফুরফুর করে হাওয়া দেবে আর সেই হাওয়া গায়ে লাগলে মেয়ে আমার সব শোক ভুলে আবার নতুন প্রেমিকের সঙ্গে সূর্যের তাজা আলোয় পার্কে মাঠে এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাবে।

হে ঈশ্বর! শীতকালে যেন এদেশে কেউ মনে কোনরকম কষ্ট না পায়। তাহলে বুকে দ্বিগুণ আঘাত বাজে। তুমি তো এদেশে অনেক বছর রইলে। তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে ঋতু পরিবর্তন এদেশের লোকের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। শীতকালে আমরা মরে থাকি আর গ্রীষ্মকালে মেতে উঠি। রোদ্দুর সারা বছরে বড় কম পাই, কিন্তু যেটুকু পাই প্রাণভরে সেটুকু উপভোগ করি।

কিন্তু হায় গ্রীষ্মের যে অনেক দেরি! এদিকে অলিভের তখন মৃতপ্রায় অবস্থা। ভাবলাম, এমনভাবে ওকে এপ্রিল-মে অবধি কিছুতেই ফেলে রাখা চলবে না, একটা ব্যবস্থা করা দরকার। শেষে কি মেয়েটা কঠিন অসুখে পড়বে।

আমি তখন নিজে উৎসাহী হয়ে ওকে জোর করে বাইরে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মেয়ে কি যেতে চায়! আমিও নাছোড়বান্দা। মা হয়ে কেমন করে ওকে এতদিন মনমরা হয়ে থাকতে দি বলো?

এসব রোগের কি ওষুধ তা তুমি নিশ্চয়ই জান। আর একজন বন্ধুর সন্ধান

পাওয়া। কিন্তু বাইরে না বেরোলে কেমন করে নতুন বন্ধু পাবে ও? সত্যি কথা বলতে কি বাছা, এমন আশ্চর্য স্বভাবের ইংরেজ মেয়ে আমি আর একটিও দেখি নি। তাই সে-সময়ে ওর ওপর রেগে গিয়ে আমি প্রায়ই বলতাম, তুই কি ইংরেজ? এত ভাবপ্রবণ হলে বিদেশীরাও যে হেসে গড়িয়ে পড়বে। হোক না অল্প বয়স, প্রেমকে অত প্রাধান্য দেয়া কেন বাপু! যারা দেয় তারা মূর্খ অকর্মণ্য। আগে কাজ পরে প্রেম। এদেশের মেয়েরা প্রেমকে কাজের মত করেই নেয়, কিন্তু প্রেম মানুষের সবকিছু আচ্ছন্ন করবে কেন। আমি তো সেকথা ভাবতেই পারি না। অবশ্য শুনি, অনেক বিদেশী মেয়েরা প্রেমের জন্যে সব ছাড়ে, কেউ কেউ নাকি আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। পাগলদের কাণ্ড যত সব। বলতে পারো, ওসব মেয়েরা অত বোকা কেন? সামান্য বুদ্ধি থাকলে তারা নিশ্চয়ই এমন কাজ করতে পারতো না। জীবন কি এমনি অবহেলার জিনিস! দুএকটা প্রেম ব্যর্থ হলে ক্ষতি কি? আমার মনে হয়, সেটা এক পক্ষে ভালই। জীবনের অনেক কিছু দেখা হয়ে যায়। জীবন ছাড়া আমাদের আর আছে কি বলো! কেন যে মানুস মরতে চায়! কী মধুময় এ মহাজীবন!

সেই কথাটা তখন অলিভকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। ও কেবলই বলে, আমি আর বাঁচতে চাই না। ওইটুকু মুখে এসব বোকামির কথা শুনে আমার শরীর জ্বলে যেত। ভাবলাম, যেমন করে হোক তাড়াতাড়ি ওর ধারণা ঘোরাতে হবে—কোনো বিশেষ মানুষকে নয় কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে নিয়ে ওকে জীবনকে ভাল লাগাতেই হবে। ওইটুকু বয়সে একটা ভুল ধারণা মনে শিকড় গাড়া খুবই ভয়ের কথা। কে জানে কি মানসিক রোগ ধরে যাবে বাপু! আমি জোর করে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে ওকে এক ক্লাবে ভরতি করে দিয়ে এলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সে-ক্লাব যেখানে তুমি ওর দেখা পেয়েছো। ক্লাবটি সত্যি ভালো, কি বলো? দেশ-বিদেশের কত ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আসে ওখানে। সাহিত্য রাজনীতি দর্শন—কত কি আলোচনা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই ক্লাবে অলিভ রিচার্ডের চেয়ে অনেক ভালো ছেলের দেখা পাবে।

আর কি আশ্চর্য, কয়েক সপ্তাহ পরে ও ওখানেই তোমাদের দেশের একজন চমৎকার ছেলের দেখা পেলো। নাম আপ্পারাও। মাদ্রাজের লোক।

প্রথমে আমাকে এসে শুধু আপ্পার কথা বলতো, জানো মা, ইণ্ডিয়ানরা খুব বুদ্ধিমান হয়, এত সুন্দর কথাবার্তা বলে ওরা—ইংরেজ ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো।

তাই নাকি? মেয়ের কথা শুনে আমি উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম, তোর সঙ্গে কোন ইণ্ডিয়ান ছেলের আলাপ হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, ওর কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মা, আমি কোনো ছেলের সঙ্গে আর বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চাই না! মেয়ের চোখ ছলছল করে ওঠে, তাই আপ্পা অনেক অনুরোধ করলেও ওর সঙ্গে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখতে আমার মন সরে না।

যা প্রাণ চায় করুক, এখন আমি আর কিছু বলবো না মেয়েকে—বলবার দরকারও হবে না। এপ্রিল আসুক, হাল্কা রোদ্দুরের স্পর্শ গায়ে লাগলে আমি জানি মেয়ে আমার চঞ্চল হয়ে সঙ্কোচের সব প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। এখন ওরা পরস্পরকে জানুক।

তারপর আমি অলিভের মুখে কেবলই আপ্পার কথা শুনতাম। সে কেমন করে কথা বলে, কি কি কথা অলিভকে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে কতো ব্যস্ত হয়—এইসব আর কি। কথা শুনে আমি মেয়েকে বলতাম, তা আপ্পাকে বল না একদিন এখানে এসে চা খেতে, আমিও আলাপ করে দেখি ছেলেটি কেমন।

না না মা, মেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলত, তাহলেই আলাপ বেশি হবে, আবার সেই যন্ত্রণা, আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াতে চাই না মা—

মুখে অলিভ যাই বলুক না কেন, ওর চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারতাম যে, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, শিগগিরই একদিন আমাকে এসে বলবে, আপ্পার মত লোক হয় না, আমি ওকে ভালবাসি মা।

তোমাকে আগেই বলেছি বাছা, ছেলেবেলায় অলিভ ইংরেজ মেয়ের মত

একেবারেই ছিলো না। কোনো ছেলের মনের অলিগলির সন্ধান পাবার আগেই তাকে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখতো। তারপর হঠাৎ যখন বুঝতো দুজনের মনের কোথাও একটা বিরাট অমিল আছে তখন তাকে রাখতে পারতো না, ছাড়তেও চাইতো না—শুধু মনের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শয্যা গ্রহণ করতো। এমন মনের অবস্থা নিয়ে চলাফেরা করলে কোনো ছেলে আর সাধ্যসাধনা করে বল! প্রত্যেকেই জীবনের তরঙ্গে তাল মিলিয়ে মেতে উঠতে চায়। ফলে তারা অলিভের অপেক্ষায় বসে থাকতো না, সে মুখ ফুটে কিছু বলবার আগে তাকে শয্যাশায়ী দেখে তারা সরে গিয়ে অন্য প্রাণচঞ্চল বন্ধু খুঁজে নিতো। মেয়ে আমার একটু বেশি ভাবে বৈকি, তোমরা যাকে বল "সীরিয়াস টাইপ"।

অবশ্য এখন অলিভের বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। এখন ও বোঝে, প্রেম করা মানেই বিয়ের স্বপ্ন দেখা নয়। এ বোধ ওর হয়েছে আপ্পার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেই। হ্যাঁ, শোন মন দিয়ে, এবার তোমাকে তোমাদের দেশের ছেলের সঙ্গে অলিভের প্রেমের কথা বলি।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হলো। আরে বাপু, আমরা কি আর কিছু বুঝি না। সারাটা জীবন তো আর চোখ বন্ধ করে কাটাই নি। ঠিক এপ্রিলে অলিভের চেহারা বদলে গেলো। আর যেমন বলেছিলাম—একদিন এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ছোট মেয়েটির মত করে বললো, আপ্পার মত লোক হয় না মা। আমি হেসে মনে মনে ভাবলাম, এ আর নতুন কথা কি, তোমার মুখ থেকে এপ্রিল মাসে যে এমন কথা শুনবো তা তো আমি আগেই জানতাম।

আর সে-বছরের এপ্রিল, বলব কি বাছা, এক সঙ্গে অত ফুল আমি আর কখনও দেখি নি, অত উজ্জ্বল রোদ আমি আর কখনও পাই নি, ইংল্যাণ্ডকে কী অপূর্ব যে মনে হয়েছিলো সে-বছর! অলিভ তো অলিভ, আমারই মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। প্রায়ই আমার অলিভের বাবার কথা মনে হতো।

হ্যাঁ বাছা, তুমি কি অলিভের বাবার কথা কিছু জানো?... বোধ হয় বাপ-মায়ের এই বিচ্ছেদের জন্যেই ও ছেলেবেলা থেকে কেমন মনমরা গোছের হয়েছে। কিছু না বুঝলেও জ্ঞান হবার পর থেকেই ও দেখছে ওর বাপ মা

কেবল ঝগড়া করে, এক সঙ্গে বেড়াতে যায় না। বাড়িতে সব সময় একটা থমথমে ভাব।

শুনি তোমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয় না। সে-কথা ভাবলে আমার ভারি অবাক লাগে। তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটাও আমার কেমন আশ্চর্য মনে হয়। জানা নেই, শোনা নেই, বাপ মা ঠিক করে দিলো আর হুট করে বিয়ে করে বসলে। অচেনা লোকের সঙ্গে তোমাদের দেশের লোকেরা কেমন করে বছরের পর বছর সংসার করে সেকথা আমি ভেবে পাই না। তার ওপর আবার ছেড়ে চলে যাবারও উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে তোমাদের দেশে যাদের ছাড়াছাড়ি হয়, শুনি সমাজে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে তাদের নাকি বেশ অসুবিধা হয়।

আমাকে মাপ কর বাছা, এসব শুনে তোমাদের সমাজের ওপর আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই। এ আবার কেমন কথা! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না থাকলেও সমাজের খাতিরে এক সঙ্গে বাস করতে হবে? নিজেকে এত বড় প্রবঞ্চনা করবার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। এ যে তিলে তিলে ক্ষয়। তোমাদের দেশে আবার মা বাপের ঠিক করা বিয়ে—আগে থেকে আলাপ না থাকলে অনেকের ক্ষেত্রে মনের মিল না হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কি জানি বাপু, এমন বিয়ের কথা আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারি না।

ছ সাত বছরের পরিচয়ের পর বিয়ে করে আমার নিজের কি হলো? অলিভের বাবা মার্টিন বিয়ের আগে একেবারে অন্য মানুষ ছিলো। বিয়ের পর তিন চার বছর আমরা বেশ ছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, হঠাৎ যে সেই এক মানুষের এত পরিবর্তন হতে পারে সেকথা অলিভের বাবার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তখন সবে অলিভের জন্ম হয়েছে, আমি ওকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, অন্য কোনোদিকে মন দেবার আমার সময় ছিলো না। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করতাম মার্টিন যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ও যেন আমাকে চেনে না, আমি যেন ওকে আর তেমনি করে বুঝতে পারি না—বড়ো অচেনা মনে হয়। এমনি করেই মাস কয়েক কাটলো তারপর আরম্ভ হলো

গোলমালের পালা। ও কেবলই আমার খুঁত ধরতে লাগলো আর অন্য কোনো বান্ধবী জুটিয়েছে বলে আমি ওকে সন্দেহ করতে লাগলাম।

এমনি মনের অবস্থা নিয়ে কি বাস করা যায়? তুমিই বলো। তোমাদের দেশে হলে তো সমাজের ভয়ে স্বামী-স্ত্রী কোনোরকমে মানিয়ে নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতো—তাই না?

আমরা কিন্তু সেকথা ভাবতেও পারি না। দারুণ দুরবস্থায় পড়বো জানলেও না। আজ আমাদের হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা আছে। ইংরেজ ঠকে না, ঠকায় না—প্রবঞ্চনার মাঝে কোনোদিনও কোনো অবস্থাতেও বাস করতে পারে না।

আমরাও একসঙ্গে বাস করতে পারলাম না। শেষ অবধি ভেবে দেখলাম, অলিভের মঙ্গলের কথা ভেবে আমাদের দুজনকে দূরে সরে যেতেই হবে। সেই নিরানন্দ পরিবেশে শিশু কেমন করে মানুষ হবে। তারপর একদিন আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেলো। গোলমালের মধ্যে দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে। যেদিন আমি বুঝেছিলাম ওর আর আমাকে ভালো লাগে না, সেইদিন থেকেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি জানি ইওরোপে স্বামী-স্ত্রীর এই ডিভোসের কথা নিয়ে তোমরা মাঝে মাঝে আমাদের ব্যঙ্গ কর, স্বার্থপর দুর্নাম দাও। শুধু তোমরা কেন, আমার কাছ থেকে সত্যি কথা শোনো বাছা, গোঁড়া ইংরেজ মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা আজও ভাবতে পারে না।

অবশ্য যে মেয়েদের সত্তা বলে কোনো পদার্থ নেই তারা একথা ভাববে কেমন করে। বড়লোকের দুলালী বউরা সব দেশেই এক। স্বামীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে তারা মুখ বুজেই থাকে।

কিন্তু আরো দেখছি তোমাদের দেশের মতো এখানেও ঘর রাখবার জন্যে বাড়াবাড়ি রকমের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। ক্যাথলিকরা জোর গলায় 'ঘর রাখো' 'ঘর রাখো' বলে চেঁচাচ্ছে। মেনে নিতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে—ঘর ভেঙে

বেরিয়ে এলে বাইরের জগতে কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না। ছন্নছাড়া জীবনে সংহতি কোথায় !

ইংল্যাণ্ডের গৃহজীবনের এই মানসিক দ্বন্দ্ব আজকাল আমাদের বড় বেশি পীড়া দেয়। অর্থাৎ মনের অমিল সত্ত্বেও মানিয়ে নিয়ে ঘর রাখলে সত্য কিংবা সত্তা রাখা যায় না, আর ও দুটো রাখলে ঘর রাখতে অসুবিধা হয়।

যাক, এসব কথা ভেবে এখন আমি আর কি করবো ! ভাববে আমার মেয়ে আর তার ছেলেমেয়েরা। আমাদের জীবন তো ফুরিয়ে এলো, যা পাবার তা পেলাম, যা হারাবার তা হারালাম। কিন্তু অলিভের বাবাকে আমি কিন্তু নতুন করে ফিরে পেতে চাই নি। ভিক্ষে করে পাওয়া জিনিসের ওপর ইংরেজের কোনো শ্রদ্ধা নেই। ও-ও আমাকে ডাকে নি, মিটমাট করবার কথা ভাবতেও পারি নি। কেন না জোড়াতালি দেয়া জীবন আমরা ঘৃণা করি।

ঘর ভাঙুক, না থাকুক স্বামী, জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ আমার ছিল—অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অপরিসীম যৌবন। এদেশের প্রত্যেকের এ দুটো জিনিস আছে। কারণ শীতের জন্যে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, পাছে পরের গলগ্রহ হই সেই ভয়ে প্রাণপণে খেটে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করি। আমাদের জীবন এতো বেশি ছকে ফেলা যে অবসর বড়ো কম। তাই আমরা সব সময় সতর্ক পাছে অবসরক্ষণ বিফলে যায়। যৌবনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই কারণ পরিশ্রম করে অর্থ আহরণ করে নিজের রোজগারে বেঁচে থাকতে হবে। তার জন্যে ফূর্তি চাই, মন সতেজ থাকা চাই, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ঘরে বসে ধ্যান করে তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রকৃতির বিপক্ষে কোনো কাজ করে ইংরেজ সহজে নিজেকে কষ্ট দিতে চায় না।

না না না, তুমি আবার অন্য কিছু ভেবো না। মাথা খারাপ ! অলিভের বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি আর বিয়ে করবার কথা কল্পনা করি নি, কাউকে ভালবাসতেও পারি নি। ওসব প্রেম ভালোবাসার ওপর আমার কেমন ঘৃণা এসে গিয়েছিলো।

কিন্তু যৌবনের দাবি অস্বীকার করবো কেমন করে? আর তা করে নিজের শরীরকে কষ্টই বা দেব কেন? ভালো না হয় কাউকে না বাসতে পারলাম, কিন্তু ভাল লাগতে তো বাধা ছিলো না। হ্যাঁ, অনেককে আমার ভালো লেগেছিলো।

কত বসন্তে-গ্রীষ্মে দেখেছি রোদ্দুরে গড়াগড়ি যাচ্ছে অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রীর দল। দেখতে দেখতে আমার শরীরে রোমাঞ্চ লাগতো। আমি মনেপ্রাণে সঙ্গী খুঁজতাম, যৌবন উপভোগ করবার উদ্দাম নেশায় যেন মাতাল হয়ে উঠতাম। তখন অনেককে আমার ভালো লেগেছে, অনেক বন্ধুর সঙ্গে আমি কতবার বাইরে গেছি!

তাই অলিভের শোক দেখে আমি অধীর আগ্রহে এপ্রিল-মে-র অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম। আমি তো জানি ইংল্যাণ্ডের ও বয়সের মেয়েদের মনের অবস্থা তখন কেমন হয়! তুমি অমন করে হাসলে কি হবে বাছা, যা বলছি একেবারে খাঁটি কথা। প্রমাণ কি পাও নি এখনও?

প্রকৃতির সঙ্গে কী বন্ধনে বাঁধা আছে এ দেশের লোকের মন! আমার বুঝতে দেরি হলো না তোমাদের দেশের আপ্পারাও ওর মনে আবার প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অলিভের এই হুপ করে প্রেমে পড়ায় আমার খুব বেশি সায় ছিল না। অনেককে দেখে, অনেককে ভালো লাগবার পর তারপর প্রেমে পড়া উচিত। তখন ওর মনের অবস্থার কথা ভেবে আমি কিছু বললাম না। ভাবলাম পরে এক সময় বলে দিলেই চলবে। ও আর বাজিয়ে দেখলো কাকে বলো? রিচার্ডের পরই তো আপ্পা।

আপ্পার সঙ্গে ও খুব ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমন কি, এক উইক এণ্ডে আইল অব ওয়াইটে গিয়ে হোটেলের এক ঘরে রাত কাটিয়ে ফিরে এলো!

তা কাটাক, তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। কেনই বা থাকবে? ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনের মানুষকে জানবার সুযোগ কেমন করে হবে ওর? কারই বা হয়? তবে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না আপ্পার সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা কিছু হয়েছে কিনা। সেটা হয়েছে জানলে তখন আমি বিচলিত

হতাম। এত অল্পদিনের আলাপে কোনো ইংরেজ মেয়ে পাকাপাকি সম্পর্কের কথা কল্পনা করে না। তবে অলিভের চাল-চলন তো ঠিক খাঁটি ইংরেজ মেয়ের মতো ছিল না, ওর ধরনধারণ একটু কেমন যেন। তাই আমার ভয় ছিলো তোমাদের দেশের আপ্পারাওকে বিয়ে করবার স্বপ্নে ও বিভোর না হয়।

শেষ অবধি আমার ভয় ভাঙলো। দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে গেলো। আবার এলো শীতের সঙ্কেত। টুপটাপ গাছের পাতা ঝরে যেতে লাগলো। দেখা দিলো কুয়াশা ভরা গম্ভীর দিন। আর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অলিভের মনের দরজাও যেন হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেলো।

ও আমাকে বললো, যেমন ভেবেছিলাম, আপ্পা ঠিক তেমন লোক নয় মা, বড়ো বেহিসেবি, বড় চঞ্চল, ওর ওপর নির্ভর করতে বাধে, অবান্তর কথা বলে কি না—

তা কি করবি ঠিক করেছিস?

মেয়ে আমার মুচকি হেসে বললো, যা বোঝাবার ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি। বলেছি, আর দেখা করবো না। জান মা, ও বড় ভাবপ্রবণ। আমার কথা শুনে চোখে জল নিয়ে বললো, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না—অলিভ আমি যে তোমাকে বিয়ে করবার আশায় এতদিন প্রহর গুনে এসেছি······এসব কথা শুনে ওর ওপর নির্ভর করবার কথা কেমন করে ভাবি বলো তো মা? আমাকে মাত্র পাঁচ মাস দেখছে—কীই বা বুঝেছে আমাকে যে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবার কথা ভেবে চোখের জল ফেলছে। আপ্পা একটু বেশি বাজে কথা বলতে ভালবাসে, না মা?

অলিভের একটু একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে দেখে আমি খুব খুশি হলাম—বুঝলে বাছা? আপ্পার সঙ্গে ও নিজেই সব শেষ করে দিলো। শীতকালে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ কম। আপ্পার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে অলিভ সার শীত ঘরে বসে পড়াশুনা করে কাটালো। ওর মন পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

এই এপ্রিলে ওর জীবনে এলে তুমি। তোমার কথা ও আমাকে কিছুই

বলতে বাকি রাখে নি। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আগামী বছর দেশে ফিরে যাবে, তোমাদের বিয়ে হবার কোনো আশাই নেই। তবু ওর তোমাকে ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ছাড়া ও আজকাল অন্য কারুর সঙ্গে মেশে না, মিশতে চায়ও না। তোমার সঙ্গে ও লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে যায়, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে সারাদিন তোমার কথা বলে।

রিচার্ড, আপ্পা আর তুমি—এই তিনজনের মধ্যে আমি দেখছি তোমাকেই ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আর তোমার কাছ থেকে সব চেয়ে বড় শিক্ষা ওর হবে। অর্থাৎ বোকা মেয়েদের মত প্রথম থেকে বিয়ের কল্পনা না করে ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারবে। আমার মনে হয় সেটাই সবচেয়ে আগে দরকার। কতো দেখতে হবে—তারপর তো বিয়ে। যারা হঠাৎ ভালবেসে ফেলে তারা দুঃখ পায়, ঠকে মরে। তাই অলিভকে আমি সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার আর কিছু করবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করে মনের দিক থেকে ওর প্রচুর লাভ হয়েছে।

হি হি হি, তবু জানো বাছা, তোমার কথা উঠলে অলিভ আজও ছেলে-মানুষের মত কথা বলে বৈ কি! বলে তুমি যখন থাকবে না—মানে তুমি দেশে ফিরে যাবে তখন খুব বেশি দরকার না থাকলে ও নাকি আর বাড়ি থেকে বার হবে না, কোথাও যাবে না, কারো সঙ্গে মিশবে না।

একুশ বছর বয়স হলো তবু এখনও ওর ছেলেমানুষী গেল না। কেউ কি অমন কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটাতে পারে—না কাটানো উচিত? ওর স্বীকার করতে বেধে যায়, স্বীকার করবার মতো বুদ্ধি ওর আজও হয় নি। কিন্তু আমি তো জানি সময় এলে ও আবার কি করবে। না না, ওর মুখে তোমার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় না যে, তোমাকে ও সহজে ভুলতে পারবে। ভোলবার দরকারই বা কি। কিন্তু উপভোগে বঞ্চিত হবে কেন! অন্য এপ্রিলে আসুক অন্য কেউ, ও উপভোগ করুক যৌবন, জীবনকে আরও ভালো করে জানুক। এমনি করে গভীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যেদিন ও

আসল মানুষের দেখা পাবে—সেদিন বলবার অপেক্ষা করতে হবে না, ওঁদের মনে আপনি জ্বলে উঠবে যুগ্ম জীবনের হোমাগ্নি।

কিন্তু সে হলো অনেক পরের কথা। এখন ওর কতোই বা বয়স! কী বোঝে ও জীবনের। এখন ও ঘুরে বেড়াক এলোমেলো হাওয়ায়, প্রেমিকের সঙ্গে গড়াগড়ি যাক হাল্কা রোদ্দুরে, যৌবন নিঙড়ে সুধা পান করুক, জীবনের সঙ্গে হোক কঠিন পরিচয়।

কিন্তু আজ আর নয়। ওই দেখ অলিভ আসছে। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে! তাই না? এপ্রিলের আকাশ আজ কী আশ্চর্য উজ্জ্বল! আমারও মন মেতে উঠছে। ওই সুন্দর ফুলগুলির দিকে শুধু একবার চেয়ে দেখো—হাল্কা হাওয়ায় বার বার কেমন দুলে দুলে উঠছে।

কী সুন্দর এই পৃথিবী!